গবেষণা সিরিজ-১৬

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

শাফায়াত দ্বারা কবীরা গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

শাফায়াত দ্বারা কবীরা গুনাহ্ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F. R.C.S (Glasgow)
জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন (QRF)
প্রফেসর অব সার্জারী
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক

কুরআন গবেষণা ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮
মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
Web site: revivedislam.com

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৩
তৃতীয় সংস্করণ : জুন ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
কিউ আর এফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই

আল মাদানী প্রিন্টার্স এন্ড কার্টুন
চ-৫৬/১, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল ঃ ০১৯১১৩৪৪২৬৫

মূল্য ৩৮.০০ টাকা

সূচীপত্র

১. ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম ৩
২. পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ ৭
৩. যে ফর্মুলা অনুযায়ী উৎসতিনটি বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ১৬
৪. মূল বিষয় ১৭
৫. ঈমান ও আমলের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর সকল মানুষ জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর সময় যে সকল বিভাগে বিভক্ত থাকবে ১৮
৬. ইসলামে দুনিয়ায় গুনাহ্ মাফ হওয়ার উপায়সমূহ ১৯
৭. শাফায়াত শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ২০
৮. যে সকল সত্তা শাফায়াত করবেন বা করতে পারবেন ২০
৯. শাফায়াত শেষ বিচারের দিন আল্লাহর রায় ঘোষণার আগে না পরে অনুষ্ঠিত হবে? ২৪
১০. শাফায়াত করার অনুমতি পাওয়ার যোগ্যতা ২৬
১১.শাফায়াতের মাধ্যমে যে ধরনের গুনাহ মাফ হবে না ২৯
১২.শাফায়াতের মাধ্যমে দোযখ থেকে মুক্তি পেয়ে বেহেশত পাওয়া যাবে কিনা? ৩৭
১৩.শাফায়াত ব্যতীত কেউ বেহেশতে যেতে পারবে কিনা ৪৭
১৪.শাফায়াতের ব্যবস্থা রাখার দুনিয়ার কল্যাণ ৪৮
১৫.শাফায়াতের দ্বারা আখিরাতের কল্যাণ ৪৯
১৬.শাফায়াত সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার কারণসমূহ এবং তার পর্যালোচনা- ৫০
  ক. দুনিয়ার বিচারে মেয়াদি শাস্তির ব্যবস্থা ৫০
  খ. আল-কুরআনের কয়েকটি আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা ৫১
১৭. কিছু বর্ণনা যা রাসূল (সা.) এর হাদীস বলে চালু আছে ৫৮
১৮.হাদীস বলে চালু হয়ে যাওয়া বর্ণনাগুলোর পর্যালোচনা ৬৯
১৯.পরকালে শাফায়াত পাওয়ার জন্যে সকলকে যা করতে হবে ৭৩
২০.শেষ কথা ৭৫

بسم الله الرحمن الرحيم

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মজীদ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন মজীদ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মজীদ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মজীদ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের

প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মজীদ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَـٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

অর্থ: 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু পায়, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।'

(২,বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য ক্ষতি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ

অর্থ: এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারী সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সা.) মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময়

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহঃ ২২, নিসাঃ ৮০) আল্লাহ রাসূলকে (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ০৯.০৩.২০০২ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশেষ করে গবেষণা বিভাগের শওকত আলী জাওহার নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন। 'কুরআনিআ' অনুষ্ঠানটি প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম শুক্রবার সকাল ১০.০০টায় অনুষ্ঠিত হয়।

নবী-রাসূল (আ.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন–এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোন নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (সা.) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক

অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল (সা.)-এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল (সা.) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (সা.) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক

বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছতে হলে ঐ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা আশ-শামছের ৭ ও ৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا– فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا– قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا–
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا–

অর্থ: শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথমে আল্লাহ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকেই বিবেক এবং বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে। আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হচ্ছে-

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلَامُ لِوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْاَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَ قَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلَاثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَ اطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ الاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَ اِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থঃ রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললোঃ হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকি। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানিতে রাসূল (স.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلٌ বলা হয়েছে। এই عَقْلٌ শব্দটিকে আল্লাহ- اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لَا يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে–

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা বিবেক -বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থ: যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

অর্থ: জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম ও তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীসের কথা বুঝার চেষ্টা করলে তারা সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট

করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল (সা.) তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌঁছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'।

   (বুখারী ও মুসলিম)

   হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌঁছে দেয়'।

   (তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে–

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,

খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,

গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয়,

ঘ. অল্পকিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তন-ভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি মূল উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে–

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না।

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি –

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর সূরা বনী ইসরাইলে বর্ণিত ইসরা বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘন্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও বা আরো উন্নতমানের রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্কের (Computer disk) ন্যায় কোনকিছুতে সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ

তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal)-এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।
বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্য বক্তব্যেও সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ্ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আল্লাহ্ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসাবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল (সা.)ও সুন্নাহর মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলাটির চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল–

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

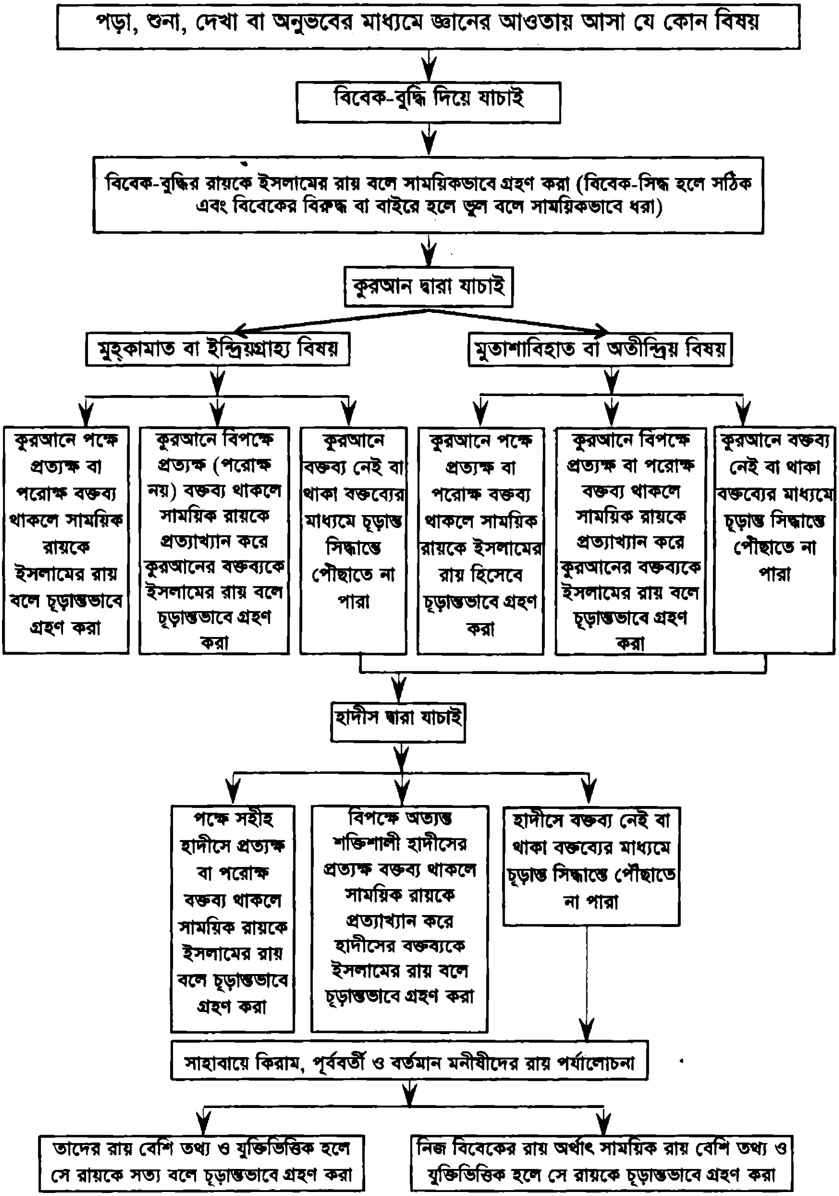
পড়া, শুনা, দেখা বা অনুভবের মাধ্যমে জ্ঞানের আওতায় আসা যে কোন বিষয়
বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই
বিবেক-বুদ্ধির রায়কে ইসলামের রায় বলে সাময়িকভাবে গ্রহণ করা (বিবেক-সিদ্ধ হলে সঠিক এবং বিবেকের বিরুদ্ধ বা বাইরে হলে ভুল বলে সাময়িকভাবে ধরা)
কুরআন দ্বারা যাচাই
মুহ্কামাত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়
মুতাশাবিহাত বা অতীন্দ্রিয় বিষয়
কুরআনে পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে ইসলামের রায় বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
কুরআনে বিপক্ষে প্রত্যক্ষ (পরোক্ষ নয়) বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে প্রত্যাখ্যান করে কুরআনের বক্তব্যকে ইসলামের রায় বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
কুরআনে বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে না পারা
কুরআনে পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে ইসলামের রায় হিসেবে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
কুরআনে বিপক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে প্রত্যাখ্যান করে কুরআনের বক্তব্যকে ইসলামের রায় বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
কুরআনে বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে না পারা
হাদীস দ্বারা যাচাই
পক্ষে সহীহ হাদীসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে ইসলামের রায় বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
বিপক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী হাদীসের প্রত্যক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে প্রত্যাখ্যান করে হাদীসের বক্তব্যকে ইসলামের রায় বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
হাদীসে বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে না পারা
সাহাবায়ে কিরাম, পূর্ববর্তী ও বর্তমান মনীষীদের রায় পর্যালোচনা
তাদের রায় বেশি তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক হলে সে রায়কে সত্য বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
নিজ বিবেকের রায় অর্থাৎ সাময়িক রায় বেশি তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক হলে সে রায়কে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা

মূল বিষয়

শাফায়াত ইসলামের একটি মূল বিষয়। কেউ শাফায়াতে বিশ্বাস না করলে তার ঈমান থাকবে না। বর্তমান মুসলিম সমাজে শাফায়াত সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে চালু থাকা তথ্যগুলো হল-

১. নবী-রাসূলগণসহ বিভিন্ন ধরনের মানুষেরা পরকালে শাফায়াত করবেন।
২. শাফায়াতের মাধ্যমে মু'মিনের কবীরা গুনাহও মাফ হয়ে যাবে।
৩. দোযখের শাস্তি ভোগ করছে এমন মুমিন ব্যক্তিদেরও শাফায়াতের মাধ্যমে দোযখ থেকে বের করে এনে বেহেশতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।
৪. কাফির ব্যক্তিরা শাফায়াতের মাধ্যমে দোযখ হতে মুক্তি পাবেন এমন ধারণা কেউ পোষণ করেন না।

শাফায়াত সম্বন্ধে ঐ সকল ধারণার বাস্তব যে কুফল মুসলিম সমাজে বর্তমানে দেখা যায় তা হল-

১. শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ পেয়ে যাবে মনে করে মুসলিমরা এমন কাজ করছে বা এমন কাজ ছেড়ে দিচ্ছে যা না করলে বা করলে কবীরা গুনাহ হবে বা দোযখে যেতে হবে বলে কুরআন বা সুন্নাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে।
২. শাফায়াত করতে পারবে ধারণা করে লোকেরা জীবিত অনেক মানুষকে, ইসলাম নিষেধ করেছে এমন উপায়ে খুশি করার চেষ্টা করছে।
৩. কবরে শুয়ে থাকা ব্যক্তির শাফায়াত পাওয়ার আশায় কবর পূজা করছে।
৪. কিছুলোক শাফায়াতের লোভ দেখিয়ে নানাভাবে মানুষকে প্রতারিত করছে।

তাই, শাফায়াত সম্বন্ধে কুরআন, হাদীস ও বিবেক - বুদ্ধির প্রকৃত তথ্য উপস্থাপন করে মানুষকে দুনিয়া ও পরকালের মহাক্ষতি থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করাই বর্তমান লেখাটির উদ্দেশ্য।

ঈমান ও আমলের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর সকল মানুষ জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর সময় যে সকল বিভাগে বিভক্ত থাকবে

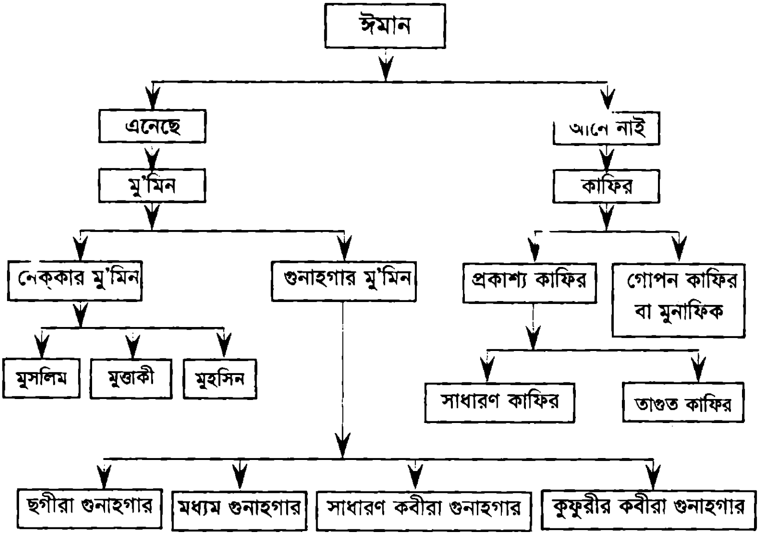
ঈমান
এনেছে
আনে নাই
মু'মিন
কাফির
নেক্কার মু'মিন
গুনাহগার মু'মিন
প্রকাশ্য কাফির
গোপন কাফির বা মুনাফিক
মুসলিম
মুত্তাকী
মুহসিন
সাধারণ কাফির
তাগুত কাফির
ছগীরা গুনাহগার
মধ্যম গুনাহগার
সাধারণ কবীরা গুনাহগার
কুফুরীর কবীরা গুনাহগার

মু'মিন হল সেই ব্যক্তি যে কালেমা তৈয়্যেবার ব্যাখ্যাসহ অর্থটি অন্তরে বিশ্বাস করে এবং মুখে তার ঘোষণা দেয়। অন্তরের বিশ্বাসটাই আল্লাহ দেখেন। মুখের ঘোষণাটি অন্য মানুষের বুঝার জন্যে যে, ব্যক্তিটি ঈমান এনেছে।

কাফির বলে সেই ব্যক্তিকে যে কালেমা তৈয়্যেবার ব্যাখ্যাসহ অর্থটি অন্তরে বিশ্বাস করে না।

নেক্কার মু'মিন হল সেই ব্যক্তি যে গুনাহ করেনি বা তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে নেয়ার কারণে যার আমলনামায় গুনাহ উপস্থিত নাই।

মুসলিম হল সর্বনিম্ন স্তরের নেক্কার মু'মিন।

মুত্তাকী হল মধ্যম স্তরের নেক্কার মু'মিন।

মুহসিন হল সর্বউচ্চ স্তরের নেক্কার মু'মিন

ছগীরা গুনাহগার মু'মিন হল সেই মু'মিন যে প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ এক বা একাধিক করণীয় কাজ ছেড়ে দেয় বা নিষিদ্ধ কাজ করে।

মধ্যম (না ছগীরা না কবীরা) গুনাহগার মু'মিন হল সেই মু'মিন যে মধ্যম (৫০%) গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার

চেষ্টাসহ এক বা একাধিক বড় করণীয় কাজ ছেড়ে দেয় বা নিষিদ্ধ কাজ করে।

সাধারণ কবীরা গুনাহগার মু'মিন বলে সেই মু'মিনকে যে প্রায় না থাকার মত গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ এক বা একাধিক বড় করণীয় আমল ছেড়ে দেয় বা নিষিদ্ধ কাজ করে।

কুফরীর কবীরা গুনাহগার মু'মিন হল সেই মু'মিন যে ইচ্ছা করে, খুশি মনে বা ঘৃণাসহকারে অর্থাৎ কোন ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত এক বা একাধিক বড় বা ছোট করণীয় কাজ ছেড়ে দেয় বা নিষিদ্ধ কাজ করে।

প্রকাশ্য কাফির হল সেই কাফির যে কালেমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যাসহ অর্থটি মনে বিশ্বাস করে না এবং প্রকাশ্যে তার ঘোষণাও দেয়।

গোপন কাফির বলে সেই কাফিরকে যে প্রকাশ্যে ঈমান আনার ঘোষণা দেয় কিন্তু অন্তরে ঈমান আনে না। এরাই হল সবচেয়ে খারাপ ধরনের কাফির।

সাধারণ কাফির হল সেই প্রকাশ্য কাফিররা যারা অন্যরা ইসলাম পালন করল কি করল না সে বিষয়ে কোন মাথা ঘামায় না।

তাগুত কাফির বলে সেই প্রকাশ্য কাফিরদের যারা অন্যদের ইসলাম পালনে নানাভাবে বাধা দেয়।

(বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ' নামক বইটিতে)

ইসলামে দুনিয়ায় গুনাহ মাফ হওয়ার উপায়সমূহ

ইসলামে দুনিয়ায় গুনাহ মাফ হওয়ার উপায় দুটি–

১. তাওবা
২. নেক আমল

তাওবার মাধ্যমে মানুষের হক ফাঁকি দেয়ার গুনাহ বাদে সকল ধরণের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু সে তাওবা হতে হবে মৃত্যু আসার মুক্তিসংগত সময় পূর্বে। অর্থ্যৎ মৃত্যু ঘটার এমন সময় পূর্বে যখন ব্যক্তির একটি গুনাহ করার সুযোগ আসলে স্বজ্ঞানে ও সক্ষমতায় তা হতে দূরে থাকার মত অবস্থা থাকে।

আর মানুষের হক ফাঁকি দেয়ার গুনাহ সে হক ফেরত দেয়ার আগ পর্যন্ত মাফ হয় না। তবে যার হক ফাঁকি দেয়া হয়েছে তাকে কোনভাবে খুঁজে পাওয়া সম্ভব না হলে সে হক গুনাহ মাফের আশায় কোন জনকল্যাণমূলক কাজে দান করে দিয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে।

নেক আমলের মাধ্যমে শুধুমাত্র ছগীরা গুনাহ মাফ হয়।

(বিষয়টি নিয়ে আলোচনা আছে 'কুরআন হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কবীরা গুনাহ সহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?' নামক বইটিতে)

শাফায়াত শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

শাফায়াত শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সুপারিশ, মাধ্যম বা দোয়া। আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে পরকালে অপরের গুনাহ বা শাস্তি মুক্তির জন্যে আল্লাহর নিকট করা সুপারিশ।

মৃত্যুর পর তাওবার মাধ্যমে গুনাহ মাফ পাওয়ার আর কোন সুযোগ থাকবে না। কিন্তু দয়াময় আল্লাহ মৃত্যুর পরও মানুষের গুনাহ মাফ হওয়ার একটি বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছেন। সে ব্যবস্থা হচ্ছে শাফায়াত।

যে সকল সত্তা শাফায়াত করবেন বা করতে পারবেন

ক. মহান আল্লাহ শাফায়াতকারী

মহান আল্লাহ যে শাফায়াতকারী হবেন এবং তাঁর শাফায়াতের কয়েকটি দিক কুরআন হাদীসে এভাবে এসেছে-

আল-কুরআন

তথ্য-১

قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

অর্থ: (হে নবী,) বলে দিন সকল শাফায়াত সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইখতিয়ারে। (শাফায়াতসহ) আকাশ ও পৃথিবীর সকল বিষয়ের সার্বভৌম কর্তৃত্ব শুধু তাঁরই। (যুমার / ৩৯: ৪৪)

তথ্য-২

مَا لَكُمْ مِنْ دُونه من وَّلِيٍّ وَّلاَ شَفِيعٍ.

অর্থ: তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্যে না আছে কোন (স্বাধীন) সাহায্যকারী এবং না আছে কোন (স্বাধীন) শাফায়াতকারী (সাজদাহ /৩২ : ৪)

তথ্য-৩

لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِه وَلِيٌّ وَّلاَ شَفِيْعٌ.

অর্থ: তিনি (আল্লাহ) ছাড়া তাদের জন্যে কোন (স্বাধীন) অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। (আনআম/৬ : ৫১)

তথ্য-৪

أَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَاءَ.

অর্থ: তবে কি তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে শাফায়াতকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে? (যুমার/৩৯ : ৪৩)

আল-হাদীস

يَا فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِىْ مِنْ مَالِىْ مَاشِئْتِ لاَ اَغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا. (متفق عليه)

অর্থ: হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা, আমার সম্পদ থেকে যা খুশি চাও। (পরকালে) আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোন উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে সহজে বুঝা যায় পরকালে অন্য কারো তো দূরের কথা, রাসূল (সা.) এরও শাফায়াতের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কারো গুনাহ মাফ করে নেয়ার ক্ষমতা থাকবে না।

☐☐ কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যসমূহসহ আরো অনেক তথ্যের আলোকে পরিষ্কারভাবে জানা ও বুঝা যায় পরকালে মূল শাফায়াতকারী অর্থাৎ-

- কাউকে শাফায়াতের অনুমতি দেয়া না দেয়ার স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী,
- কারো শাফায়াত কবুল করা না করার স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী এবং
- নিজ ইচ্ছায় গুনাহ মাফ করার অধিকারী সত্তা হবেন মহান আল্লাহ।

তাই দুনিয়ার কোন ব্যক্তিকে নজর-নিয়াজ দিয়ে খুশি করতে পারলে তিনি জোর করে আল্লাহর নিকট থেকে শাফায়াত আদায় করে দিতে পারবেন, এ ধারণা পোষণ করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করার অর্থ যে কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত স্পষ্ট বক্তব্যগুলোকে অস্বীকার করার গুনাহ, তা বুঝা মোটেই কঠিন নয়, যদি বুঝতে চাওয়া হয়।

খ. কুরআন শাফায়াতকারী

তথ্য-১

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَة شَفِيعًا لأَصْحَابه.

অর্থ: আবু উমামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তোমরা পবিত্র কুরআন পাঠ কর (জ্ঞান অর্জন কর)। নিশ্চয়ই তা কিয়ামতের ময়দানে তার সাথীদের জন্যে সুপারিশ করতে উপস্থিত হবে। (মুসলিম)

তথ্য-২

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سُلَيْمٍ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اَفْضَلُ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْقُرْآنِ لاَنَبِىَّ وَلاَ مَلَكٌ وَلاَ غَيْرُهُ.

অর্থ: সাঈদ ইবনে সুলাইম (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নবী, ফেরেশতা বা অন্য কেউ কুরআন হতে শ্রেষ্ঠ শাফায়াতকারী হতে পারবে না।

তথ্য-৩

عَنْ جَابِرٍ (رضـــ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَ مَاحِلٌ مَصَدّقٌ مَنْ جَعَلَهُ اَمَامَهُ قَادَمَهُ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِه سَاقَطَهُ الَى النَّار.

অর্থ: জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : কুরআন পাক এত বড় সুপারিশকারী যে, তার আবেদন রক্ষা করা হবে। এত বড় একরোখা জেদী যে, তার অভিযোগ মেনে নেয়া হবে। যে একে সম্মুখে রাখবে তাকে সে বেহেশতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। আর যে একে পিছনে ফেলে রাখবে, তাকে সে ধাক্কা দিয়ে দোযখে ফেলে দেবে।

❑❑ এ তথ্যগুলো থেকে জানা ও বুঝা যায়, পরকালে আল-কুরআন শাফায়াত করবে। আর আল-কুরআনের শাফায়াতের দু'টি বিশেষ দিক হবে-

- আল্লাহর অনুমতিসাপেক্ষে কুরআন শাফায়াত করবে।

- কুরআনের পক্ষের বা বিরোধী শাফায়াতকে নবী-রাসূল (সা.) সহ কোন মানুষ বা ফেরেশতা খণ্ডাতে পারবে না। আর ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআনের জ্ঞান অর্জন এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল না করলে, পরকালে কুরআন বিপক্ষে সাক্ষী দিবে তথা বিপক্ষে সুপারিশ করবে একথা কুরআন ও রাসূল (সা.) স্পষ্টকরে জানিয়ে দিয়েছেন।

গ. রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) শাফায়াতকারী

আল-কুরআন

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ.

অর্থ: হে নবী, সে ব্যক্তিকে (শাফায়াতের মাধ্যমে) কে বাঁচাতে পারে, যার উপর আযাবের ফয়সালা হয়ে গেছে। তুমি কি তাকে (শাফায়াতের মাধ্যমে) বাঁচাতে পারবে যাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে? (যুমার : ১৯)

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথমে আল্লাহ বলেছেন যার উপর শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে তাকে নবী-রাসূলসহ কোন মানুষই শাফায়াতের মাধ্যমে বাঁচাতে পারবে না। তারপর রাসূল (সা.) কে নির্দিষ্ট করে বলেছেন যাকে আল্লাহ দোযখে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে শাফায়াতের মাধ্যমে তিনিও বাঁচাতে পারবেন না। এখান থেকে বুঝা যায় নবী-রাসূলগণ শাফায়াত করার অধিকারী হবেন।

আল-হাদীস

তথ্য-১

اَنَا اَوَّلَ شَافِعٍ وَّ اَوَّلَ مُشَفَّعٍ.

অর্থ: আমিই (রাসূল সা.) প্রথম শাফায়াতকারী ও আমার শাফায়াতই প্রথমে গ্রহণ করা হবে। (বুখারী, মুসলিম)

তথ্য-২

পূর্বে উল্লিখিত (পৃষ্ঠা নং ২১) হাদীসখানি যেখানে রাসূল (সা.) তাঁর কন্যা ফাতেমা (রা.) কে বলেছেন, কিয়ামতের দিন (স্বাধীনভাবে) তিনি শাফায়াত বা অন্য কোনভাবে তাঁর কোন উপকারে আসতে পারবেন না।

❑❑ কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে বুঝা যায়, রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) শাফায়াত করবেন এবং তিনিই প্রথম শাফায়াতকারী হবেন।

ঘ. অন্য নবী-রাসূলগণ ও সাধারণ মানুষ শাফায়াতকারী

আল-কুরআন

উপরে উল্লিখিত সূরা যুমায়ের ১৯ নং আয়াতের আলোকে বুঝা যায় অন্য নবী-রাসূলগণ ও অন্য কিছু মানুষ পরকালে শাফায়াত করতে পারবেন।

আল-হাদীস

يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَةٌ: اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ.

অর্থ: তিন ধরনের লোক কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবেন (করার অনুমতি পাবেন) নবীগণ, আলেমগণ ও শহীদগণ। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা: নবী-রাসূলগণ বাদে অন্য যে সকল মানুষ শাফায়াত করার অনুমতি পাবেন, তাদের নিশ্চয়ই সকল গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে অর্থাৎ নিষ্পাপ (নেককার মু'মিন) হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কারণ, তা না হলে তাদের নিজেদেরই অন্য কারো শাফায়াতের মাধ্যমে শাস্তি থেকে রেহাই পেতে হবে। সহজেই বুঝা যায় এ ধরনের মানুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য হবে।

ঙ. ফেরেশতাগণ শাফায়াতকারী

ফেরেশতাগণ শাফায়াত করবেন তা জানা ও বুঝা যায় সূরা আম্বিয়ার ২৮ নং, নজমের ২৬ নং আয়াত এবং কিছু হাদীসের (পরে আসছে) মাধ্যমে।

শাফায়াত শেষ বিচারের দিন আল্লাহর রায় ঘোষণার আগে না পরে অনুষ্ঠিত হবে?

প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সঠিক উত্তরের সঙ্গে পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টি সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। তাই চলুন, বিবেক-বুদ্ধি, কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে উত্তরটি ভালভাবে জেনে ও বুঝে নেয়া যাক-

বিবেক-বুদ্ধি

বিবেক-বুদ্ধি বলে পরকালে শাফায়াত তথা সুপারিশের মাধ্যমে গুনাহ মাফ পেতে হলে, তা হতে হবে আল্লাহ বিচার-ফয়সালা করে শাস্তি ঘোষণা করা তথা দোযখে পাঠিয়ে দেয়ার আগে। কারণ-

ক. আল্লাহ শাস্তি ঘোষণা করা বা দোযখে পাঠিয়ে দেয়ার পর শাফায়াতের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করার অর্থ হচ্ছে-

১. আল্লাহর বিচারে ভুল থাকা,

২. অন্য কারো দ্বারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে পাল্টাতে বাধ্য করা। এরকম অবস্থার কথা চিন্তা করাও কুফরীর গুনাহ।

খ. একজন বিচারক বিচার করে ফায়সালা দিয়ে দিলে উচ্চতর আদালতে আবেদন ও পুনর্বিবেচনার মাধ্যমেই শুধু সে রায় পরিবর্তন হতে পারে। একই আদালতে একই বিচারকের মাধ্যমে তা আর হয় না। পরকালের আদালতে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী একজনমাত্র বিচারক থাকবেন। তিনি হবেন মহান আল্লাহ।

তাই শাফায়াত হতে হবে আল্লাহ বিচার-ফয়সালা করে রায় ঘোষণা করার আগে।

আল-কুরআন

তথ্য-১

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ط أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ. لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ لا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ط وَعْدَ اللهِ لَايُخْلِفُ اللهُ الْمِيعَادَ.

অর্থ: (হে নবী,) সে ব্যক্তিকে কে বাঁচাতে পারবে, যার উপর শাস্তির ফয়সালা হয়ে গিয়েছে? তুমি কি তাকে বাঁচাতে পারবে যাকে আগুনে (দোযখে) পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে? অবশ্য যারা তাদের রবকে ভয় করে চলে তাদের জন্যে তৈরি রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। এটা আল্লাহর ওয়াদা। আর আল্লাহ কখনও নিজের কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (যুমার : ১৯, ২০)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন শেষবিচার দিনে বিচারের রায় ঘোষণার পর নবী-রাসূল (সা.) গণ সহ কেউই শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার শাস্তি ভোগ করা থেকে বাঁচাতে পারবে না। শাফায়াতের অনুষ্ঠান পরকালে হবে এটি কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিশ্চিত। তাই এ আয়াতের আলোকে সহজেই বলা যায় শাফায়াত হবে শেষবিচারের দিন আল্লাহর রায় ঘোষণার আগে।

তথ্য-২

আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে (পরে আসছে) আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে, আল্লাহ্ বিচার করে যাদের দোযখে পাঠিয়ে দিবেন তাদের চিরকাল সেখানে থাকতে হবে। তাই শাফায়াতের মাধ্যমে গুনাহ মাফ করাতে হলে সে শাফায়াত অবশ্যই আল্লাহ বিচারের রায় ঘোষণা করার আগে হতে হবে।

আল-হাদীস

পূর্বে উল্লিখিত (পৃষ্ঠা নং ২১) হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর কন্যা ফাতেমাসহ কোন মানুষকেই পরকালের বিচারের সময় আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করার ব্যাপারে তিনি স্বাধীনভাবে কোন উপকার করতে পারবেন না।

বিচার অনুষ্ঠানের সময় রাসূল (সা.) যদি কাউকে কোন উপকার করতে না পারেন তবে বিচারের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে দোযখে পাঠিয়ে দেয়ার পর আল্লাহর সিদ্ধান্তকে শাফায়াতের মাধ্যমে আবার পরিবর্তন করাতে পারার প্রশ্নই আসে না।

❑❑ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির এ সকল তথ্যের আলোকে নিশ্চয়তাসহকারে বলা যায় শাফায়াত হবে শেষবিচারের দিন মহান আল্লাহ বিচারের রায় ঘোষণা করার আগে।

শাফায়াত করার অনুমতি পাওয়ার যোগ্যতা

বিবেক-বুদ্ধি

যে ব্যক্তি অন্যের গুনাহ মাফের জন্যে আল্লাহর নিকট শাফায়াত করবেন তাকে অবশ্যই যোগ্য হতে হবে। সাধারণ বুদ্ধিতে সহজেই বুঝা যায় যার নিজের জন্যে শাফায়াত লাগবে সে অন্যের জন্যে শাফায়াত করার যোগ্য হতে পারে না। তাই শাফায়াত করার যিনি যোগ্য হবেন তার আমলনামায় কোন গুনাহ থাকা চলবে না। অর্থাৎ তাদের নেক্কার মু'মিন হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আবার এটিও সহজে বুঝা যায় নিম্নস্তরের নেক্কার মু'মিনগণের (মুসলিম) চেয়ে সর্বোচ্চ স্তরের নেক্কার মু'মিনগণের (মুহসিন) শাফায়াতের অনুমতি পাওয়া বেশি যুক্তি সংগত

আল-কুরআন

তথ্য-১.১

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

অর্থ: কে আছে এমন যে (আল্লাহর) অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট শাফায়াত করতে পারবে? (বাকারা /২ : ২৫৫)

তথ্য-১.২

مَا مِنْ شَفِيْعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ.

অর্থ: তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি ছাড়া শাফায়াত করার কেউ নেই। (ইউনুস/১০ : ৩)

তথ্য-১.৩

يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

অর্থ: এমন একদিন আসবে যে দিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। (হুদ / ১১ : ১০৫)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা

আল-কুরআনের এ তথ্যগুলো এবং আরো অনেক তথ্য থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, পরকালে শাফায়াতকারীকে শাফায়াত করার জন্যে আল্লাহর নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে। আর অনুমতি নেয়ার শর্ত রাখা থেকেই বুঝা যায়, আল্লাহ সকলকে শাফায়াতের অনুমতি দিবেন না। ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে যাকে তিনি যোগ্য মনে করবেন, তাকেই শুধু তিনি শাফায়াত করার অনুমতি দিবেন। কিন্তু কী হবে সেই যোগ্যতা তা এ আয়াতখানি হতে বুঝা যায় না।

তথ্য-২

وَلاَ يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: তাঁকে (আল্লাহকে) বাদ দিয়ে এই লোকেরা যাদের ডাকে তাদের শাফায়াত করার কোন ক্ষমতাই নেই। ঐ লোকেরা ব্যতীত যারা জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেয়। (যুখরুফ / ৪৩ : ৮৬)

ব্যাখ্যাঃ আয়াতে কারীমায় আল্লাহ প্রথমে বলেছেন, পরকালে তিনি ব্যতীত অন্য কারো শাফায়াত করার স্বাধীন ক্ষমতা নেই। সবাইকে তাঁর অনুমতি নিয়ে শাফায়াত করতে হবে। এরপর আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি শাফায়াতের অনুমতি দিবেন তাদের যারা দুনিয়ায় জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে। চিরসত্য জ্ঞান হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহের জ্ঞান। তাই জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হচ্ছে, ঐ সত্যকে জেনে ও বুঝে নিয়ে (না জেনে না বুঝে নয়), বাস্তব কাজের মাধ্যমে তার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়া।

তাহলে মহান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, পরকালে শাফায়াতের অনুমতি পাবে বা অনুমতি পাওয়ার যোগ্য হবে শুধু সেই ব্যক্তিরা, যারা কুরআন ও সুন্নাহের বক্তব্যকে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিকভাবে জেনে ও বুঝে নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করেছে। কারণ জানা ও বুঝা না থাকলে অবশ্যই আমলে ভুল হবে বা আমল বাদ যাবে। এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন শর্ত। এখান থেকে বুঝা যায়, শাফায়াতের অনুমতি খুব কম ব্যক্তি বা সত্তারাই পাবেন। আর সাধারণ জ্ঞানে বুঝা যায় নবী-রাসূলগণ বাদে সেই ব্যক্তিরা হবে তারা, যারা ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ স্তরের নেককার মু'মিন হিসেবে ইন্তেকাল করবেন।

তথ্য-৩

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ مَا اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَ لاَ بِكُمْ.

অর্থ ঃ বল আমি কোন নতুন রাসূল নই। আমি জানি না আমার ও তোমাদের সাথে কি আচরন করা হবে। (আহকাফ/৪৬ : ৯)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেও জানেন না পরকালে সাহাবায়েকেরাম ও তাঁর সাথে কি আচরন করা হবে। পরকালে আচরণ করার স্বাধীন ক্ষমতা থাকবে শুধু মহান আল্লাহর। সে দিন তিনি প্রধানত দু'ধরনের আচরণ বা কাজ করবেন। যথা-

ক. বিচার করে চূড়ান্ত পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া এবং

খ. যোগ্য ব্যক্তিকে শাফায়াত করার অনুমতি দেয়া।

রাসূল (সা.) কে বিচার করে শাস্তি দেয়ার প্রশ্ন আসে না। তাই রাসূল (সা.) যে বলেছেন, তাঁর সঙ্গে কী আচরণ করা হবে তা তিনি জানেন না এ কথাটির একটিমাত্র অর্থ হবে। আর সে অর্থ হচ্ছে পরকালে বিভিন্ন ব্যক্তির

জন্যে শাফায়াতের অনুমতি দেয়া না দেয়ার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কী আচরণ করা হবে, তা তিনি জানেন না।

রাসূল (সা.) এর ন্যায় ব্যক্তিই জানেন না তাঁকে কোন ব্যক্তির জন্যে শাফায়াতের অনুমতি দেয়া হবে আর কোন ব্যক্তির জন্যে শাফায়াতের অনুমতি দেওয়া হবে না। এখান থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় নবী-রাসূল বাদে অন্য যারা শাফায়াতের অনুমতি পাবেন তাদের মুহসিন মানের নেক্‌কার মু'মিন হতে হবে।

আল-হাদীস

أُمُّ الْعَلَى (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لاَ أَدْرِىْ وَاللهِ لاَ أَدْرِىْ وَ أَنَا رَسُوْلُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلاَ بِكُمْ.

অর্থ: উম্মুল আ'লা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, (আখিরাতে) আমার সাথে কী.আচরণ করা হবে, তা আমি জানি না। আর এটাও আমি জানি না (সে দিন) তোমাদের সাথে কী ব্যবহার করা হবে। অথচ আমি আল্লাহর রাসূল। (বুখারী)

ব্যাখ্যা: রাসূল (সা.) দু'বার আল্লাহর কসম খেয়ে অর্থাৎ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, পরকালে তাঁর সঙ্গে এবং সাহাবায়ে কিরামদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করা হবে তা রাসূল হওয়া সত্ত্বেও তিনি জানেন না।

এ হাদীসখানি ৩ নং তথ্যের সূরা আহকাফের ৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যার অনুরূপ।

❑❑ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির এ সকল তথ্যের আলোকে স্পষ্টভাবে জানা যায় শাফায়াত করার জন্যে আল্লাহর নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে। আর নবী-রাসূল বাদে শুধুমাত্র মুহসিন স্তরের নেক্‌কার মু'মিনগণ শাফায়াত করার যোগ্য বলে বিবেচ্য হতে পারেন।

শাফায়াতের মাধ্যমে যে ধরনের গুনাহ্ মাফ হবে না

বিবেক-বুদ্ধি

তথ্য-১

দয়াময় আল্লাহ কুরআন সুন্নাহের মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে খালিস নিয়াতে তওবা করে পরিপূর্ণ ইসলামে ফিরে আসলে তিনি মু'মিন ব্যক্তিদের (মানুষের হক ফাঁকি দেয়ার গুনাহ ব্যতীত) সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন। যে দুষ্ট মু'মিন আল্লাহর দেয়া এই অপূর্ব সুযোগ গ্রহণ না করে কবীরা গুনাহসহ তথা সমাজে বড় অশান্তি সৃষ্টিকারী অন্যায় কাজসহ মৃত্যুবরণ করল তার ঐ কবীরা গুনাহ পরকালে শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ হওয়ার যুক্তিসংগত (বিবেক-সম্মত) নয়।

তথ্য-২

ইসলাম কবর পূজা, পীর পূজা ইত্যাদি বন্ধ করতে চায়। শাফায়াতের মাধ্যমে পরকালে কবীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে তথ্যটি ঐ ধরনের কাজ করার জন্যে মানুষকে দারুণভাবে উৎসাহিত করে। তাই শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, এধরনের কথা ইসলামের তথ্য হওয়ার কথা নয়।

আল-কুরআন

তথ্য-১

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ ج حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الْآنَ وَلاَ الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا.

অর্থ: অবশ্যই আল্লাহ তাঁদের তওবা কবুল করবেন, যারা জাহালত (অজ্ঞতা, ধোঁকা, লোভ-লালসা ইত্যাদি) এর কারণে গুনাহের কাজ করে বসে। অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে নেয়। এরাই হল সে সব লোক, যাদের আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ সর্ববিষয় অভিজ্ঞ ও অতীব বুদ্ধিমান। আর এমন লোকদের জন্যে কোন ক্ষমা নেই, যারা অন্যায় কাজ করে যেতেই থাকে যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়। তখন তারা

বলে, আমি এখন তওবা করছি। অনুরূপভাবে তাদের জন্যেও কোন ক্ষমা নেই যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থেকে যায়। এদের জন্যে আমি কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (নিসা : ১৭, ১৮)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এ আয়াত দু'খানির মাধ্যমে প্রথমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই সে ঈমানদারদের ক্ষমা করে দিবেন যারা অজ্ঞতা, ভুল বা ধোঁকায় পড়ে পাপ কাজ করে ফেলার সাথে সাথে তওবা করবে অর্থাৎ খালিস নিয়াতে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইবে এবং পরবর্তীতে সেই গুনাহের কাজ করা থেকে বিরত থাকবে।

এরপর আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, যে সকল মু'মিন ব্যক্তি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে গুনাহের কাজ করে যাবে এবং মৃত্যু উপস্থিত হলে তওবা করবে, তাদের তিনি ক্ষমা করবেন না।

আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মু'মিন ব্যক্তি মৃত্যুর যুক্তিসংগত পূর্বে তাওবা করে মাফ করিয়ে না নিয়ে গেলে তিনি আর তাদের গুনাহ মাফ করবেন না। তাই এ দু'খানি আয়াতের আলোকে এতটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, পরকালে শাফায়াতের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হলেও তাতে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

তথ্য-২

إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيْمًا.

অর্থ: যে সকল গুনাহ হতে তোমাদের (মু'মিনদের) বিরত থাকতে বলা হয়েছে তার মধ্যকার বড় (কবীরা) গুলো হতে যদি বিরত থাকতে পার তবে তোমাদের অন্য গুনাহসমূহ আমি নিজ থেকে রহিত (মাফ) করে দিব এবং তোমাদের সম্মানের স্থানে (বেহেশতে) প্রবেশ করাব। (নিসা : ৩১)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ঈমানদার ব্যক্তিরা কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে বা মুক্ত হতে পারলে তাদের অন্য সকল গুনাহ তিনি নিজ থেকে কোন না কোনভাবে মাফ করে দিয়ে বেহেশত দিয়ে দিবেন।

কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা বা মুক্ত হওয়ার উপায় হচ্ছে কবীরা গুনাহ না করা বা কবীরা গুনাহ হয়ে গেলে মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে খালিস নিয়তে তওবা করে মাফ করিয়ে নেয়া। আর মৃত্যুর পর গুনাহ মাফের উপায় হচ্ছে শাফায়াত বা আল্লাহর নিজ ইচ্ছা।

তাহলে এ আয়াতে কারীমার মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তওবার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ করিয়ে নিয়ে যে মু'মিন মৃত্যুবরণ করবে তার অন্য ধরনের গুনাহ থাকলে তা শাফায়াত বা নিজ ইচ্ছায় মাফ করে দিয়ে তিনি তাদের চিরকালের জন্যে বেহেশত দিয়ে দিবেন। তাই এ আয়াত থেকে জানা যায় শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

তথ্য-৩

وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ أَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا بِالْحُسْنَى. الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ.

অর্থ: আর পৃথিবী ও মহাকাশের সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান মহান আল্লাহ। যেন তিনি গুনাহকারীদের তাদের আমলের প্রতিফল দেন এবং নেক আমলকারীদের দেন ভাল ফল। যারা বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে তারা (কোন কারণে) ছোট-খাট গুনাহ করে থাকলে নিশ্চয়ই তোমার রবের ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত। (নাজম : ৩১, ৩২)

ব্যাখ্যা: এ আয়াত দু'খানির মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে সকল মু'মিন কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত হতে বা মুক্ত থাকতে পারবে তাদের অন্য গুনাহ তিনি মাফ করে দিবেন। অর্থাৎ এ আয়াতের মাধ্যমেও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ তিনি মাফ করবেন না।

তথ্য-৪

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ.

অর্থ: তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তা শুধু দুনিয়ার কয়েক দিনের জন্যে। আর আল্লাহর নিকট যা রয়েছে (বেহেশতের সামগ্রী) তা অতীব উত্তম ও চিরস্থায়ী। সেগুলো হচ্ছে ঐ লোকদের জন্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের রবের উপর ভরসা রাখে। আর যারা কবীরা (বড়) গুনাহসমূহ ও নির্লজ্জ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং রাগ হলে ক্ষমা করে দেয়। (শুরা : ৩৬, ৩৭)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে এবং পরের আয়াতে (৩৮ নং) কিছু বড় সওয়াব ও কিছু বড় (কবীরা) গুনাহ নাম ধরে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন বেহেশতের অধিকারী হবে শুধু সে মু'মিনরা যারা নাম উল্লেখ করাগুলোসহ অন্য সকল কবীরা গুনাহ হতে মুক্ত থাকবে। অর্থাৎ কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন বেহেশত পাবে না। তাই এখান থেকেও স্পষ্টভাবে বোঝা যায় পরকালে শাফায়াত বা অন্যকোনভাবে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

তথ্য-৫

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا.

অর্থ: সে দিন (শেষ বিচারের দিন), শাফায়াত ফলদায়ক (কবুল) হবে না ঐ ব্যক্তির (শাফায়াত) ব্যতিত যাকে আল্লাহ অনুমতি দিবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন। (তোয়াহা/২০ ঃ ১০৯)

ব্যাখ্যা: এখানে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, শাফায়াতকারীকে প্রথমে আল্লাহর নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে। তারপর তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, অনুমতি তিনি তাকেই দিবেন যার কথা তাঁর পছন্দ হবে। এটি সহজেই বুঝা যায় যে, একজনের কথা আরেকজনের পছন্দ হওয়ার জন্যে, দুটি শর্ত পূরণ হওয়ার প্রয়োজন হয়। যথা–

ক. যে কথা বলছেন তাকে পছন্দ হওয়া। কারণ, পছন্দের ব্যক্তির কথা পছন্দ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

খ. যে কথাটি বা কথাগুলো বলা হচ্ছে সে কথাটি বা কথাগুলো পছন্দ হওয়া।

তাই এ আয়াতে কারীমা অনুযায়ী সহজেই বলা ও বুঝা যায়–

ক. শাফায়াতকারী ব্যক্তিকে শাফায়াতের অনুমতি পাওয়ার জন্যে আল্লাহর পছন্দসই ব্যক্তি হতে হবে। পূর্বে উল্লেখিত কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের মাধ্যমে আমরা জেনেছি, অল্লাহর সেই পছন্দের ব্যক্তি হলেন তারা যারা জেনে বুঝে আমল করে মুহসিন স্তরের নেককার মুমিন হিসেবে মৃত্যু বরণ করেছেন।

খ. আল্লাহ শাফায়াতকারীর শুধু ঐসকল কথা অর্থাৎ ঐ সকল গুনাহ মাফের আবেদন পছন্দ তথা কবুল করবেন যা তিনি কবুল করার যোগ্য মনে করবেন। অন্য আয়াতে উল্লেখিত তথ্যের আলোকে জানা যায় সে গুনাহ হবে কবিরা গুনাহ ভিন্ন অন্য গুনাহ অর্থাৎ সগীরা ও মধ্যম গুনাহ।

তথ্য-৬

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ

অর্থ: এবং তারা (ফেরেশতারা) শাফায়াত করবে না তাদের ব্যতিত যাদের (শাফায়াত পাওয়ার) ব্যাপারে আল্লাহ রাজী বা সন্তুষ্ট। (আম্বিয়া/২১ ঃ ২৮)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ফেরেশতাসহ, কোন শাফায়াতকারী তাদের জন্যে শাফায়াত করবে না তথা শাফায়াত করার অনুমতি পাবেন না যাদের শাফায়াত পাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ রাজি বা সন্তুষ্ট নন। অর্থাৎ যাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট নন তাদের ব্যাপারে শাফায়াত কবুল করাতো দুরের কথা আল্লাহ কাউকে শাফায়াত করার অনুমতিও দেবেন না। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সন্তুষ্ট নন তারা নিশ্চয় সগীরা গুনাহগার নয় বরং কবীরা গুনাহগার ব্যক্তিই হবে।

তথ্য-৭

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

অর্থ: (শেষ বিচারের দিন) জালিমদের জন্যে কোন দরদী বন্ধু হবে না। আর না সেদিন তাদের ব্যাপারে কোন শাফায়াতকারীর শাফায়াত কবুল করা হবে। (সুরা মুমিন / ৪০ ঃ ১৮)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, শেষ বিচারের দিন যালিমদের ব্যাপারে কারো শাফায়াত কবুল করা হবে না। সুরা হুজরাতের ১১নং আয়াতের মাধ্যমে জানা যায়, তাওবা করে গুনাহ মাফ না করিয়ে মৃত্যুবরণকারী কবীরা গুনাহগার মুমিনকে পরকালে জালিম বলে গণ্য করা হবে। তাই, এই আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে বলা যায়, বড় গুনাহগার মুমিনগণ

যেহেতু জালিম হিসেবে গণ্য হবে তাই তাদের ব্যাপারে করা শাফায়াত আল্লাহ কবুল করবেন না।

তথ্য-৮

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَأَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا.

অর্থঃ এবং যে (মু'মিন বা কাফির) কোন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে তার শাস্তি দোযখ। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার উপর আল্লাহর গযব ও অভিশাপ এবং তার জন্যে কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। (নিসা /৪: ৯৩)

ব্যাখ্যাঃ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা কবীরা গুনাহ। তাই আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, যে সকল মু'মিন একটি মাত্র কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করবে তাদের চিরকাল দোযখে থাকতে হবে। অর্থাৎ শাফায়াত বা অন্যকোনভাবে পরকালে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

আল-হাদীস

তথ্য-১

يَا فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِيْ مِنْ مَالِيْ مَاشِئْتِ لَا اَغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. (متفق عليه)

অর্থঃ হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা, আমার সম্পদ থেকে যা কিছু খুশী চাও। (পরকালে) আল্লাহ নিকট জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোনই উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ রাসূল (সা.) এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন অন্যকারো ব্যাপারে তো দূরের কথা তার প্রাণপ্রিয় কন্যার গুনাহও পরকালে শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ করিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তিনি কিছুই করতে পারবেন না। তাই এ হাদীসের আলোকে সহজে বলা যায়, সকল ধরনের গুনাহ না হলেও কারো কবীরা গুনাহ যে রাসূল (সা.) শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ করতে পারবেন না তা নিশ্চিত। আর রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) শাফায়াতের মাধ্যমে যে ধরনের গুনাহ মাফ করতে পারবেন না, অন্য কোন ব্যক্তিও যে তা পারবেন না সেটিও নিশ্চিত করেই বলা যায়।

তথ্য-২

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْمَلُوْا وَ سَدِّدُوْا
وَقَارِبُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ اَحَدًا لَنْ يُّدْخِلَهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ.

অর্থ: আমল কর এবং নিজের সাধ্য মত সর্বাধিক সংখ্যক সঠিক কাজ করার চেষ্টা কর এবং সত্যের কাছাকাছি থেক। জেনে রেখ, কোন ব্যক্তিকে শুধু তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না।

সাহাবায়ে কিরামগণ রাসূল (সা.) এর বক্তব্য শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), আপনার আমলও কি পারবে না? তিনি উত্তর দিলেন-

وَلاَ اَنَا اِلاَّ اَنْ يَّتَغَمَّدَنِىَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ.

অর্থ: না, আমিও না, যদি না আমার রব তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত করেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমদ)

ব্যাখ্যা: আমলের ব্যাপারে অত্যন্ত বাস্তব যে কথাটি রাসূল (সা.) হাদীসখানির শেষে উল্লেখ করেছেন, সে কথাটি দিয়ে ব্যাখ্যা শুরু করলে পুরো হাদীসখানি বুঝতে সহজ হবে।

হাদীসখানির শেষে রাসূল (সা.) বলেছেন, নিখুঁতভাবে সকল আমলে সালেহ পালন করে পৃথিবীর কেউই এমনকি তিনিও জান্নাতে যেতে পারবেন না। কারণ, সকলের জীবনেই কোন না কোন আমল করার ব্যাপারে কিছু না কিছু খুঁৎ থাকবেই। আর ঐ খুঁৎ দুনিয়া ও আখিরাতে কোন না কোনভাবে আল্লাহ মাফ করে দিলেই শুধু জান্নাত পাওয়া সম্ভব হবে।

তাই হাদীসটির প্রথমে রাসূল (সা.) বলেছেন, যত বেশি সংখ্যক আমল ঈমানের দাবি অনুযায়ী যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব তা করার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। আর কোন আমল বাধ্য হয়ে ছাড়তে হলে সত্যের কাছাকাছি থাকতে হবে। অর্থাৎ গুনাহ না হওয়ার স্তরের কাছাকাছি থাকতে হবে। আমল ছাড়ার পর গুনাহ না হওয়ার স্তরের কাছাকাছি স্তর হিসেবে ছগীরা গুনাহগারের স্তরকে অবশ্যই ধরা যাবে। মধ্যম গুনাহগারের স্তরকে ধরা যেতেও পারে। কিন্তু কবীরা গুনাহগারের স্তরকে অবশ্যই ধরা যাবে না।

তাই এ হাদীসখানির আলোকে বলা যায় পরকালে শাফায়াতের মাধ্যমে ছগীরা গুনাহ অবশ্যই মাফ হবে, মধ্যম গুনাহ মাফ হতেও পারে কিন্তু কবীরা গুনাহ অবশ্যই মাফ হবে না।

❑❑ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির এ সকল এবং এ ধরনের আরো অনেক তথ্যের আলোকে সহজেই বলা যায় পরকালে শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

শাফায়াতের মাধ্যমে দোযখ থেকে মুক্তি পেয়ে বেহেশত পাওয়া যাবে কি?

বিবেক-বুদ্ধি

তথ্য-১

ঈমান আনা আমলটির একটি সরল অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর ইলাহিত্বকে তথা আল্লাহর সরকারকে স্বীকার করা। আর কিছুদিন বা কিছুকাল, অনন্তকালের তুলনায় অতি নগণ্য পরিমাণ সময়, চাই সে কিছুকাল যত বড়ই হোক না কেন। তাই মানুষের দুনিয়ার জীবনে কিছুকাল ও অনন্তকালের কাছাকাছি বর্ণনা হবে-এক সেকেন্ড বা তারও কম সময় এবং সারা জীবন। সুতরাং বড় গুনাহ করলেও ঈমান থাকলে কিছুকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করে অনন্তকালের জন্যে বেহেশত পাওয়া বিষয়টিকে দুনিয়ার যে কোন দেশের অপরাধের জন্যে জেল খাটা এবং সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া বিষয়টির সঙ্গে মেলালে যে তথ্যটি দাঁড়ায় তা হচ্ছে- উপস্থিত সরকারকে স্বীকার করলে বড় অপরাধ করলেও এক সেকেন্ড বা তার চেয়ে কম সময় জেল খাটার পর মুক্তি পেয়ে বাকি জীবন মহা শান্তিতে মুক্তভাবে কাটানোর ব্যবস্থা থাকা।

পৃথিবীর কোন দেশের আইন-কানুনে যদি ঐ ধরনের একটি কথা বা তথ্য সত্যিই উপস্থিত থাকে আর তা সকলের জানা থাকে, তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ঐ দেশে বড় বড় অপরাধীর সংখ্যা অগণিত হবে এবং সেখানকার সমাজ জীবনে শান্তির লেশমাত্রও থাকবে না। তথা সেখানকার সমাজ জীবন ব্যর্থ হবে।

'একজন ঈমানদার ব্যক্তি বড় গুনাহগার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেও পরকালে কিছু দিন দোযখে থেকে শাফায়াতের মাধ্যমে চিরকালের জন্যে বেহেশতে যেতে পারবে' এমন একটি কথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় উপস্থিত থাকলে বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী তার অবশ্যম্ভাবী ফল যা হবে তা হচ্ছে– অসংখ্য ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি ছোট-খাট বা না থাকার ন্যায়

ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহকারে ইসলামের বড় বড় আমল ছেড়ে দিবে-বিশেষ করে যে আমলগুলো পালন করতে ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার বা ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। আর এর চূড়ান্ত ফল দাঁড়াবে –

১. মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য (আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা) বাস্তবায়ন করা কল্পনার বিষয় হিসেবে থেকে যাবে। কারণ, তা করতে হলে অসংখ্য মু'মিনকে বিপদসংকুল, কষ্টসাধ্য ও কঠিন ত্যাগ স্বীকার লাগে, এমন অনেক কাজ করতে হবে।
২. মুসলিম সমাজ বা দেশ অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অশান্তি ইত্যাদিতে ভরে যাবে।

তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সহজে বলা যায় শাফায়াতের মাধ্যমে দোযখ থেকে বের হয়ে চিরকালের জন্যে বেহেশত পাওয়া যাবে এ ধরনের কথা ইসলামের কথা হতে পারে না।

তথ্য-২

কবীরা গুনাহ হচ্ছে বড় অপরাধ। ইসলামী জীবন বিধানে দুনিয়াতে বড় অপরাধ করা মু'মিনদের স্থায়ী শাস্তি তথা মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। যেমন অন্যায়ভাবে হত্যার শাস্তিস্বরূপ মু'মিনকে হত্যা করা, জেনার জন্যে মু'মিনকে সংগেসার করা। তাই কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের পরকালে স্থায়ী শাস্তি তথা স্থায়ী দোযখের শাস্তির ব্যবস্থা, ইসলাম সম্মত হওয়ার কথা। অর্থাৎ শাফায়াতের মাধ্যমে দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা নয়।

আল-কুরআন

তথ্য-১

أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِيْنَ أُوتُوْا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُوْنَ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُوْدَاتٍ صلے وَغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُوْنَ.

অর্থ: তুমি কি তাদের অবস্থা দেখনি, যাদের কিতাবের কিয়দংশ দেয়া হয়েছে? তাদেরকে যখন পরস্পরের মধ্যে (উপস্থিত থাকা দ্বন্দ্বের) ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহর কিতাবের (আল-কুরআন) দিকে ডাকা হয়, তখন একটি দল পাশ কেটে যায় এবং (কিতাবের ফয়সালা হতে) অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা এরূপ করে এ কারণে যে, তারা বলে (মনে করে) দোযখের আগুন আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। আর করলেও তা অল্প কিছু দিনের বেশি হবে না। আসলে মনগড়া ধারণা-বিশ্বাস তাদেরকে তাদের দীন সম্বন্ধে বড়ই ভুলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

(আলে-ইমরান : ২৩-২৪)

ব্যাখ্যা: আয়াত দু'খানির ব্যাখ্যা বুঝতে হলে প্রথমে যে বিষয়টি বুঝে নিতে হবে তা হচ্ছে-আল্লাহর পাঠানো কিতাবের সংখ্যা চারটি। যথা-তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন। এ চারখানি কিতাবের মধ্যে পরিপূর্ণখানি হচ্ছে আল-কুরআন। অর্থাৎ আল-কুরআনে ইসলামের সকল দিক ও বিষয় জানিয়ে দেয়া হয়েছে। পূর্বের তিনখানি কিতাবে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত না হলেও সকল কিতাবে তিনটি বিষয়ে কোন পার্থক্য নেই। সে তিনটি বিষয় হচ্ছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ, নবী-রাসূল ও পরকাল সম্বন্ধে সকল কিতাবের মূল বক্তব্য একই। ইসলাম পালনের বিধি-বিধান অর্থাৎ শরীয়াতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে পূর্বের তিনটি কিতাব ও কুরআনের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

আলোচ্য আয়াত দু'খানিতে যাদেরকে আল্লাহর কিতাবের কিয়দংশ দেয়া হয়েছে তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন বাদে অন্য কিতাবধারীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ জানিয়েছেন ঐ কিতাবধারীদের যখন তাদের মধ্যকার বিরোধের ফয়সালার জন্যে পরিপূর্ণ কিতাব তথা আল-কুরআনের ফয়সালার দিকে ডাকা হয় তখন তাদের একদল তা মেনে নেয় এবং এক দল অমান্য করে।

এরপর আল্লাহ জানিয়েছেন, যে দল কুরআনের ফয়সালা অমান্য করে তারা কি ধারণা-বিশ্বাসের কারণে তা করে। আল্লাহ জানিয়েছেন যে, তারা অমান্য করে এটি মনে করে যে, দোযখের আগুন তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। আর করলেও তা শুধু অল্প কিছু দিনের জন্যে হবে। ঐ ধারণা-বিশ্বাস সম্বন্ধে আল্লাহ ২৪ নং আয়াতের শেষে বলেছেন- ঐ ধারণা-বিশ্বাস তাদের মনগড়া এবং সেটি তাদের দীন তথা ইসলাম সম্বন্ধে একটি চরম ভুল ধারণা।

একটু চিন্তা করলে সহজে বুঝা যায়; ঐ লোকদের ধারণা-বিশ্বাস ছিল, যেহেতু তারা তৌহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস করে (অর্থাৎ তাদের ঈমান আছে) এবং তারা পরিপূর্ণ ইসলাম তথা কুরআনিক ইসলামের কিছু অনুসরণ করে, সেহেতু কুরআনের দু'একটি বিষয় বা ফয়সালা না মানলে তাদের দোযখে যেতে হবে না। আর যেতে হলেও তা চিরস্থায়ী হবে না। অল্প কিছু দিন শাস্তি ভোগ করে তারা ঈমান ও কিছু সৎ আমলের জন্যে চিরকালের দরুন বেহেশত পেয়ে যাবে।

কুরআনের ফয়সালা না মানা কবীরা গুনাহ। তাই আল্লাহ আয়াত দু'খানির মাধ্যমে সকল মুসলমানকে জানিয়ে দিয়েছেন, ঈমান থাকলে দু'একটি কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করলে কিছু দিন দোযখ ভোগ করে শাফায়াত বা অন্য কোনভাবে চিরকালের জন্যে বেহেশত পাওয়া যাবে এ তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃত তথ্যটি হচ্ছে (তওবার মাধ্যমে মাফ না করিয়ে) একটিও কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করলে মু'মিনকে চিরকাল দোযখে থাকতে হবে।

তথ্য-২

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُوْدَةً ط قُلْ أَاتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ. بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ط هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

অর্থঃ এবং তারা বলে, দোযখের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না। আর করলেও তা অল্প কিছুদিনের বেশি হবে না। তাদের জিজ্ঞাসা কর, তোমরা কি আল্লাহর নিকট থেকে (ঐরকম) কোন প্রতিশ্রুতি পেয়েছ যা তিনি ভঙ্গ করবেন না? না তোমরা এমন কথা আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিচ্ছ, যা (সত্য কিনা তা) তোমরা জান না? নিশ্চয়ই যারা গুনাহ করেছে এবং (মৃত্যু পর্যন্ত) ঐ গুনাহ দ্বারা পরিবেষ্টিত থেকেছে তারা হবে দোযখের অধিবাসী এবং চিরকাল তাদের সেখানে থাকতে হবে। (বাকারা : ৮০, ৮১)

ব্যাখ্যাঃ ৬ নং তথ্যের আয়াত দু'খানির ন্যায় আলোচ্য ৮০ নং আয়াতের প্রথমে কিতাবধারীরা পরকালে দোযখের শাস্তি ভোগ করার বিষয়ে একই

ধারণা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে একই ধরনের কথা বলেছে। অর্থাৎ তারা বলেছে, যেহেতু তাদের ঈমান তথা তৌহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস আছে তাই আল-কুরআন তথা পরিপূর্ণ ইসলামের দু'একটি বিষয় পালন না করলে তাদের দোযখে যেতে হবে না। আর যেতে হলেও তা হবে অল্প কয়েক দিনের জন্যে।

কিতাবধারীদের ঐ ধরনের বিশ্বাসের উত্তরে আল্লাহ এখানে প্রথমে তাদের জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন যে, তারা কি ঐ রকম কোন ওয়াদা তাঁর নিকট থেকে পেয়েছে যা তিনি ভাঙবেন না– নাকি তারা না জেনে একটি ভুল বা মিথ্যা কথা আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিচ্ছে? অর্থাৎ আল্লাহ প্রশ্ন করার মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, ঐ রকম কোন ওয়াদা তাঁর নাই। তাই গুনাহের জন্যে কিছু দিন দোযখের শাস্তি ভোগ করে চিরন্তনভাবে বেহেশতে যেতে পারার মত কোন ঘটনা পরকালে ঘটবে না।

এরপর ৮১ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন যারা গুনাহ করবে এবং গুনাহে পরিবেষ্টিত থেকে মৃত্যুবরণ করবে অর্থাৎ মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে তওবা করে ঐ গুনাহ মাফ করিয়ে না নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের দোযখে যেতে হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকতে হবে। তাই পূর্বের তথ্যসমূহের আলোকে এ তথ্যখানি থেকেও সহজে জানা ও বুঝা যায়, কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন শাফায়াত বা অন্য কোনভাবে দোযখ থেকে মুক্তি পাবে না।

❑❑ কেউ কেউ বলতে চান বা বলে থাকেন যে আল-কুরআনের এ দু'টি তথ্যের বক্তব্য অন্য নবীর উম্মতের জন্যে প্রযোজ্য, শেষ নবীর উম্মতের জন্যে প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবী-রাসূল (সা.) গণের উম্মতরা গুনাহগার মু'মিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাদের চিরকাল দোযখে থাকতে হবে। কিন্তু শেষ নবীর উম্মতের বেলায় তা হবে না। তারা কিছুকাল দোযখে থেকে বের হয়ে এসে চিরকালের জন্যে বেহেশতে যেতে পারবে। এ ব্যাখ্যা সত্য বলে ধরে নেয়ার অর্থ হচ্ছে- মহান আল্লাহর বিচারের নীতিমালা ইনসাফভিত্তিক নয়। কারণ তিনি শুধু জন্মের সময়ের ভিন্নতার জন্যে একই ধরনের অপরাধের জন্যে মানুষকে অপরিসীম পার্থক্যসম্বলিত শাস্তি দিবেন (নাউযুবিল্লাহ)।

তথ্য-৩

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ط أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ.
لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ لا
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ط وَعْدَ اللهِ لاَ يُخْلِفُ اللهُ الْمِيْعَادَ.

অর্থ: (হে নবী,) সে ব্যক্তিকে কে বাঁচাতে পারে, যার উপর শাস্তির ফয়সালা হয়ে গিয়েছে? তুমি কি তাকে বাঁচাতে পারবে যাকে আগুনে (দোযখে) পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে? অবশ্য যারা তাদের রবকে ভয় করে চলে তাদের জন্যে তৈরি রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্নাধারা প্রবাহিত। এটা আল্লাহর ওয়াদা। আর আল্লাহ কখনও নিজের কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (যুমার : ১৯, ২০)

ব্যাখ্যা: কারো ওয়াদার (প্রতিশ্রুতির) একটি রূপ হচ্ছে তার দ্বারা নির্ধারিত করা নীতিমালা। তাই কোন বিষয়ে আল্লাহর ওয়াদার একটি রূপ হচ্ছে ঐ বিষয়ে আল্লাহর নির্ধারিত নীতিমালা। পূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মু'মিনদের পরকালে দোযখ ও বেহেশতের শাস্তি ও পুরস্কার দেয়ার তাঁর নির্ধারিত নীতিমালা তথা ওয়াদা হচ্ছে– যে মু'মিন (তওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে) একটিও কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করবে তাকে চিরকাল দোযখে থাকতে হবে। আর যে মু'মিন কৃত কবীরা গুনাহ তওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে তিনি তাকে চিরকালের জন্যে বেহেশত দিয়ে দিবেন।

আলোচ্য প্রথম আয়াতখানিতে রাসূল (সা.) কে প্রশ্ন করার মাধ্যমে, সকলকে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর নির্ধারিত নীতিমালা তথা ওয়াদা অনুযায়ী বিচার করে যাকে তিনি দোযখে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে রাসূল (সা.) সহ কেউই উদ্ধার করতে পারবে না।

সবশেষে 'আল্লাহ কখনও নিজের কৃত ওয়াদা খেলাফ করেন না' কথাটির মাধ্যমে আল্লাহ পরিষ্কার করে দিয়েছেন, পরকালে শাস্তি ও পুরস্কার দেয়ার ব্যাপারে তাঁর কৃত ওয়াদা অর্থাৎ তাঁর তৈরি করা ও জানিয়ে

দেয়া নীতিমালা তিনি ভঙ্গ করবেন না। অর্থাৎ আল্লাহ এখানে এটি নিশ্চিত করেছেন যে কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন চিরকাল দোযখে এবং কবীরা গুনাহ ছাড়া মৃত্যুবরণকারী মু'মিন চিরকাল বেহেশতে থাকবে। আর তাঁর নির্ধারিত এই নীতিমালা বা তাঁর করা এ ওয়াদা কোনক্রমেই লংঘিত বা পরিবর্তিত হবে না।

তথ্য-৪

পূর্বে উল্লিখিত আল-কুরআনের বেশ কয়েকটি তথ্যের মধ্যে আমরা স্পষ্টভাবে জেনেছি যে পরকালে মহান আল্লাহ কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনদের কোনভাবে মাফ করবেন না। তাই ঐ সকল আয়াতের ভিত্তিতেও বলা যায় যে পরকালে কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনদের দোযখে যেতে হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকতে হবে। শাফায়াত বা অন্য কোন উপায়ে সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না।

☐☐ মুহাম্মদ ঃ ২৫-২৮; বাকারা ঃ ৮৫-৮৬; বাকারা ঃ ২৭৫; নিসা ঃ ১৩-১৪; সাজদা ঃ ২০; সাজদা ঃ ১২-১৪; শূরা ঃ ৪৪-৪৭; যুখরূফ ঃ ৭৪-৭৮ এবং জ্বিন ঃ ২৩ প্রভৃতি আয়াতের তথ্য থেকেও বলা যায়, কবীরা গুনাহ সহ মৃত্যুবরণকারী মুমিন চিরকাল দোযখে থাকতে হবে। অর্থাৎ তাদের জন্যে কোন শাফায়াত নেই।

আল-হাদীস

তথ্য-১

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ عُظَمِ الْمُسْلِمِيْنَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى هَذَا فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ، فَاَقْبَلَ الرَّجُلُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مُسْرِعًا. فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ قُلْتَ لِفُلَانٍ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ اِلَيْهِ، وَكَانَ مِنْ اَعْظَمِنَا غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ لاَ يَمُوْتُ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا جُرِحَ اِسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، وَ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ.

অর্থ: সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) এর সঙ্গে থেকে যে সমস্ত মুসলমান যুদ্ধ করেছেন, তাদের মাঝে একজন ছিল তীব্র আক্রমণকারী। নবী করীম (সা.) তার দিকে নজর করে বললেন: যে ব্যক্তি কোন জাহান্নামীকে দেখতে ইচ্ছা করে সে যেন এই লোকটার দিকে নজর করে। উপস্থিত লোকদের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি সেই লোকটির অনুসরণ করল। আর সে তখন প্রচণ্ডভাবে মুশরিকদের সঙ্গে মুকাবিলা করছিল। এক পর্যায়ে সে আহত হয়ে তাড়াতাড়ি মৃত্যুবরণ করতে চাইল। এ জন্যে সে তরবারীর তীক্ষ্ম দিকটি তার বুকের উপর দাবিয়ে দিল। দু'কাঁধের মাঝ দিয়ে তরবারীটি বক্ষ ভেদ করল। এটি দেখে লোকটি নবী (সা.) এর কাছে দৌড়ে এসে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি সত্যিই আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী হল? লোকটি বলল, আপনি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন: 'যে ব্যক্তি কোন জাহান্নামী লোক দেখতে চায় সে যেন এ লোকটাকে দেখে নেয়।' অথচ লোকটি অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অধিক আক্রমণকারী ছিল। সুতরাং আমার ধারণা হয়েছিল, এ লোকটির মৃত্যু এহেন অবস্থায় হবে না। অতঃপর সে আঘাতপ্রাপ্ত হল, তাড়াতাড়ি মৃত্যু কামনা করল এবং আত্মহত্যা করে বসল। নবী (সা.) এ কথা শুনে বললেন, নিশ্চয় কোন বান্দা জাহান্নামীদের আমল করে মূলত সে জান্নাতী। আর কোন বান্দা জান্নাতী লোকের আমল করে মূলত সে

জাহান্নামী। নিশ্চয়ই আমলের ভাল-মন্দ নির্ভর করে তার শেষ আমলের উপর। (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ আত্মহত্যা করা একটি কবীরা গুনাহ। হাদীসখানিতে দেখা যায়, রাসূল (সা.) এর একজন সাহাবী কাফির-মুশরিকদের সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করেছে এবং যুদ্ধে যখম হয়ে যন্ত্রণা থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাওয়ার জন্যে আত্মহত্যা করেছে অর্থাৎ একটি কবীরা গুনাহ করেছে। আর ঐ একটি কবীরা গুনাহের জন্যে তার ঠিকানা জাহান্নাম বলে রাসূল (সা.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই হাদীসখানি থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা ও বুঝা যায়, একটিও কবীরা গুনাহ করলে ঈমানদার ব্যক্তিকে দোযখে যেতে হবে (যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা করে তা মাফ করিয়ে না নেয়)।

তথ্য-২

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْمُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُوْلُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ كُلٌّ خَالِدٌ فِيْمَا هُوَ فِيْهِ .

অর্থঃ ইবনে ওমর (রা.) রাসূল (সা.) এর নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করেন, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং দোযখবাসীরা দোযখে প্রবেশ করবে। তখন একজন ঘোষক উভয়ের প্রতি ঘোষণা করবেন, হে জাহান্নামবাসী, তোমাদের আর মৃত্যু হবে না। হে জান্নাতবাসী, তোমাদেরও আর মৃত্যু হবে না। যে যেখানে আছ চিরদিন সেখানে থাকবে।

(বুখারী, মুসলিম, তাফসীরে মাযহারী সূরা হুদের ১০৭ নং আয়াতের তাফসীর)

তথ্য-৩

وَاَخْرَجَ الْبُخَارِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ وَلاَ مَوْتٌ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ لاَ مَوْتٌ.

অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, (মানুষকে বেহেশত ও দোযখে প্রবেশ করানোর পর) ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাতবাসী, চিরদিন থাক মৃত্যুহীনভাবে। হে জাহান্নামবাসী, চিরদিন থাক মৃত্যুহীনভাবে।

(বুখারী, তাফসীরে মাযহারী সূরা হুদের ১০৭ নং আয়াতের তাফসীর)

তথ্য-৪

وَقَدْ جَاءَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ فِىْ صُوْرَةِ كَبْشٍ
اَمْلَحٍ فَيُذْبَحُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ
فَلاَ مَوْتٌ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ فَلاَ مَوْتٌ.

অর্থঃ ছাগলের সুরতে মৃত্যুকে হাজির করা হবে। অতঃপর দোযখ ও বেহেশতের মধ্যবর্তী স্থানে তাকে জবাই করা হবে। তখন ঘোষণা করা হবে, হে বেহেশতবাসী, চিরদিন এখানে থাকবে, তোমাদের আর মৃত্যু হবে না এবং হে দোযখবাসী, চিরদিন এখানে থাকবে, তোমাদের আর মৃত্যু হবে না।

(বুখারী, মুসলিম, তাফসীরে ইবনে কাসীর সূরা হুদের ১০৮ নং আয়াতের তাফসীর)

তথ্য-৫

وَاَخْرَجَ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ وَ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ مُعَاذِ
بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنَ
فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْكُمْ مُخْبِرُكُمْ اِنَّ الْمَرَدَّ اِلَى اللهِ اِلَى الْجَنَّةِ اَوِ
النَّارِ. خُلُوْدٌ بِلاَ مَوْتٍ وَاِقَامَةٍ بِالْاَظْعَنِ فِىْ اَجْسَادٍ لاَ تَمُوْتَ.

অর্থঃ মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) তাঁকে ইয়েমেনে প্রেরণ করলে তিনি সেখানে পৌঁছে জনতাকে বলেন, হে লোকেরা, আমি তোমাদের কাছে রাসূল (সা.) এর দূত হিসেবে এসেছি। তিনি তোমাদের এ খবর জানাতে বলেছেন যে, সকলকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। গন্তব্যস্থান হবে জান্নাত বা জাহান্নাম। উভয়টিতে অবস্থান হবে

চিরস্থায়ী। মৃত্যু নেই সেখানে। নেই স্থানান্তর। সেখানকার অবস্থান হবে দৈহিক ও মৃত্যুহীন।
(তিবরানী, হাকেম, তাফসীরে মাযহারী সূরা হুদের ১০৭ নং আয়াতের তাফসীর)

তথ্য-৬

وَ اَخْرَجَ الطَّبَرَانِىُّ وَ اَبُوْ نَعِيْمٍ وَابْنُ مَرْدُيَّةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قِيْلَ لِأَهْلِ النَّارِ اَنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ عَدَدَ كُلِّ حَصَاةٍ لَفَرِحُوْابِهَا. وَلَوْ قِيْلَ لِاَهْلِ اَلْجَنَّةِ اَنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ عَدَدَ كُلِّ حَصَاةٍ لَحَزِنُوْا وَ لَكِنْ جَعَلَ لَهُمُ الْأَبَدَ.

অর্থ: হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, দোযখবাসীদের যদি বলা হয়, এখানে উপস্থিত অগণিত পাথরের সমপরিমাণ সময় তোমরা দোযখে থাকবে তবে তারা খুব খুশি হবে। আবার জান্নাতবাসীদের যদি বলা হয় এখানে উপস্থিত অগণিত পাথরের সমপরিমাণ সময় তোমরা জান্নাতে থাকবে তবে তারা ভয়ানক দুঃখিত হবে। কিন্তু তাদের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী। (তিবরানী, আবু নাঈম, মারদুইয়া)

☐☐ এ সকল হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় মু'মিন ও কাফির যাকেই আল্লাহ শাস্তি দিয়ে দোযখে পাঠিয়ে দিবেন তাকে চিরকাল সেখানে থাকতে হবে। শাফায়াত বা অন্যকোন উপায়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসা যাবে না।

হাদীসকখানির বক্তব্য আর এ বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য একই। তাই হাদীসকখানি অত্যন্ত শক্তিশালী হাদীস। অর্থাৎ উসূলে হাদীস অনুযায়ী এ হাদীসকটির বিপরীত বক্তব্যধারী যেকোন হাদীসকে এ হাদীসকখানি রহিত করে দিবে।

শাফায়াত ব্যতীত কেউ বেহেশতে যেতে পারবে কিনা

পূর্বেই কুরআন ও হাদীসের তথ্যের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি পরকালে নবী-রাসূল (সা.) গণসহ কিছু মানুষ শাফায়াতের অনুমতি পাবেন তথা শাফায়াত করতে পারবেন।

যারা শাফায়াত করতে পারার মর্যাদা পাবেন তারা প্রথমে অন্য কারো শাফায়াতের মাধ্যমে গুনাহ মুক্ত হয়েছেন এটি একটি অযৌক্তিক কথা। তাই বিবেক-বুদ্ধির আলোকে যে ব্যক্তিরা পরকালে শাফায়াত করার অনুমতি পাবেন, তারা অবশ্যই শাফায়াত ছাড়া বেহেশতে যাবেন। ঐ ব্যক্তিরা হলেন মুহসিন স্তরের নেক্কার মু'মিনগণ। তবে যে সকল মু'মিন সকল গুনাহ জীবিত অবস্থায় মাফ করিয়ে নিয়ে নেক্কার মু'মিন হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে পারবেন তারা সকলেই শাফায়াত ছাড়া বেহেশতে যাবেন সাধারণ বিবেক তাই বলে।

বাকি থাকে ঐ হাদীসখানির কথা (পৃষ্ঠা নং ৩৬ যেখানে রাসূল (সা.) বলেছেন, অন্য কেউ তো দূরের কথা তিনি নিজেও আল্লাহর রহমত ছাড়া বেহেশতে যেতে পারবেন না। এ কথাটির অর্থ এই নয় যে, পরকালে শাফায়াতের মাধ্যমে গুনাহ মাফ করিয়ে নিয়ে কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না। বরং এ কথার অর্থ হবে দয়াময় আল্লাহ গুনাহ মাফের যে নীতিমালা জানিয়ে দিয়েছেন সে নীতিমালার বাইরে কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না। অর্থাৎ পরকালে বেহেশত পেতে হলে তাওবার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ করিয়ে নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

শাফায়াতের ব্যবস্থা রাখার দুনিয়ার কল্যাণ

এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, শাফায়াতের একটি ব্যবস্থা পরকালে থাকবে। ঐ শাফায়াত ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা আরো যা জেনেছি তা হচ্ছে-

১. শাফায়াতকারীকে প্রথমে আল্লাহর অনুমতি পেতে হবে।
২. শাফায়াত কবুল করে কারো গুনাহ বা শাস্তি মাফ করা না করা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইখতিয়ারে থাকবে।
৩. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনদের শাফায়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মাফ করবেন না।

শাফায়াত সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যসমূহ থেকে জানা ও বুঝা যায় যে, শাফায়াতের মাধ্যমে গুনাহ্ মাফ হওয়ার সকল বিষয় তথা শাফায়াত কে করতে পারবে, শাফায়াত কবুল হওয়া না হওয়া ইত্যাদি সবই মহান আল্লাহ্র ইখতিয়ারাধীন বা নিয়ন্ত্রণে। তাহলে তিনি নিজেই তো ঐ গুনাহ্গুলো মাফ করে দিতে পারতেন কিন্তু তা না করে তিনি শাফায়াতের মাধ্যমে পরকালে গুনাহ মাফ করানোর একটি ব্যবস্থা রেখেছেন। অন্য কথায় বলা যায়, মাফ করে দেয়ার মানুষ, কুরআন ও ফেরেশতাদেরকে সুপারিশ করার একটা নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা দিয়েছেন। কেন তিনি এমন করলেন, তা সত্যিই একটি চিন্তার বিষয়, তাই না?

আল্লাহর করা বা আল্লাহ্র দেয়া কোন নিয়ম-কানুন বা ব্যবস্থা তিনি কেন করেছেন এ কথাটা বুঝতে হলে সব সময় মনে রাখতে হবে, আল্লাহ যেখানেই যে ব্যবস্থা করেছেন, তার সবই মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করার জন্যে তথা তাঁর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হওয়ার সুবিধার কথা সামনে রেখেই করেছেন। এ কথাটি সামনে রেখে শাফায়াতের ব্যাপারে মানুষকে কিছু নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা দেয়ার পেছনে যে প্রধান কারণ বিদ্যমান বলে মনে হয়, তা হচ্ছে– তাঁর প্রিয় বান্দাদের শাফায়াত করার অধিকার দেয়ার মাধ্যমে পরকালেও তাদের মর্যাদা, সম্মান বা কিছু নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা দেয়া। সম্মান, মর্যাদা বা ক্ষমতা সকল মানুষই পেতে চায়। তাই পরকালে মুহসিন পর্যায়ের নেককার মু'মিনদের শাফায়াতের অধিকার দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ সকল মানুষকে উৎসাহ দিয়েছেন যেন তারা সকলে ঐ সম্মান, মর্যাদা ও ক্ষমতা পাওয়ার জন্যে ঐ ধরনের নেককার মু'মিন হওয়ার চেষ্টা করে বা প্রতিযোগিতা করে। আর তা হলে মানুষের দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হবে। অর্থাৎ আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে বা বাস্তবায়ন করা সহজ হবে।

শাফায়াতের দ্বারা আখিরাতের কল্যাণ

আমরা জেনেছি যে ইসলামে গুনাহ তিন ধরনের– কবীরা, মধ্যম ও সগীরা। আমরা আরো জেনেছি যে কবীরা গুনাহ মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে কৃত তাওবা ব্যতীত মাফ হয় না। আর ছগীরা গুনাহ যেহেতু তাওবা

এবং নেক আমল তথা নামাজ, রোজা, ওজু, গোসল, সত্যকথা বলা, সুবহানাল্লাহ বলা ইত্যাদি দ্বারা মাফ হয় তাই একজন মু'মিনের আমল নামায় ছগীরা গুনাহ থাকার সম্ভাবনা কম। অতএব পরকালে শাফায়াত দ্বারা ছগীরা গুনাহ মাফ হলেও তা প্রধানত মধ্যম গুনাহ মাফ হওয়ার কাজে আসবে। অর্থাৎ শাফায়াতের পরকালীন প্রধান কল্যাণ হবে মু'মিনের মধ্যম ধরনের গুনাহ মাফ হওয়া।

হাদীস থেকে শাফায়াতের মাধ্যমে পরকালে মানুষের আর যে উপকার হবে বলে জানা যায় তা হচ্ছে-

ক. বেহেশত পাওয়া ব্যক্তিদের স্তরের পরিবর্তন হওয়া। অর্থাৎ নিম্ন স্তরের বেহেশত থেকে শাফায়াতের মাধ্যমে উচ্চ স্তরের বেহেশত পাওয়া সম্ভব হবে।

খ. বেশি আযাবের দোযখ হতে মানুষের জন্যে কল্যাণমূলক কাজ করেছে এমন দোযখীদের শাফায়াতের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম আযাবের দোযখে নেয়া সম্ভব হবে। যেমন একটি হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূল (সা.) এর শাফায়াত কবুল করে আল্লাহ তাঁর চাচা আবু তালিবকে বেশি শাস্তির দোযখ থেকে কম শাস্তির দোযখে নিয়ে আসার অনুমতি দিবেন।

শাফায়াত সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার কারণসমূহ এবং তার পর্যালোচনা

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে শাফায়াত সম্বন্ধে ভুল তথা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বিরুদ্ধ যে ধারণা ব্যাপকভাবে সৃষ্টি ও চালু হয়েছে তার প্রধান তিনটি কারণ হচ্ছে-

ক. দুনিয়ার বিচারের মেয়াদি শাস্তির ব্যবস্থা,

খ. আল-কুরআনের কয়েকটি আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা এবং

গ. কিছু বর্ণনা, যা রাসূল (সা.) এর বক্তব্য বলে চালু আছে।

চলুন, এখন এ তিনটি বিষয় পর্যালোচনা করা যাক–

ক. দুনিয়ার বিচারের মেয়াদি শাস্তির ব্যবস্থা

ইসলামে দুনিয়ার বিচারের অপরাধের জন্যে মেয়াদি তথা ১, ২, ৫, ১০ ইত্যাদি দিন, মাস বা বছরের শাস্তি আছে। তাই মনে করা হয় পরকালের

বিচারেও মেয়াদি শাস্তি থাকবে। অর্থাৎ পরকালে মানুষ কৃত গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পর কৃত সওয়াবের পুরস্কার স্বরূপ অনন্তকালের জন্যে শাফায়াত বা অন্য কোন উপায়ে বেহেশত পেয়ে যাবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত বিষয়টি হচ্ছে-দুনিয়ার মু'মিন অপরাধীদের জন্যে মেয়াদি ও স্থায়ী উভয় শাস্তিই ইসলামী আইনে আছে। যেমন কোন মুমিন কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে তাকেও হত্যা করতে হবে। বিবাহিত জেনা কারীকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। তাই পরকালেও মু'মিনের জন্যে স্থায়ী শাস্তি তথা স্থায়ী দোযখের শাস্তি হবে সেটাই স্বাভাবিক। দুনিয়ার ছোট অপরাধের জন্যে অস্থায়ী শাস্তি হয় এবং অতিবড় অপরাধের জন্যে স্থায়ী শাস্তি হয়। মহান আল্লাহ্ অতীব দয়ালু, তাই তিনি পরকালে শুধুমাত্র অতিবড় (কবীরা) গুনাহের জন্যে স্থায়ীভাবে দোযখের শাস্তি দিবেন। আর অন্য গুনাহের জন্যে তিনি কাউকে দোযখের শাস্তিই দিবেন না।

খ. আল-কুরআনের কয়েকটি আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা

আল-কুরআনের যে কোন আয়াতের ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার একটি মূল নীতি হচ্ছে- প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা একই বিষয় বর্ণনাকারী অন্য সকল আয়াতের ব্যাখ্যার সম্পূরক বা পরিপূরক হওয়া, বিরোধী না হওয়া। এবং অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা স্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। কারণ, সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন আল-কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন বক্তব্য নেই। তাফসীরের এ গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি সামনে রেখে চলুন এখন সেই ক'টি আয়াতকে পর্যালোচনা করা যাক যার অসতর্ক ব্যাখ্যা শাফায়াত সম্বন্ধে মুসলমান সমাজে ভুল ধারণা সৃষ্টি ও চালু হওয়ার পেছনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে-

তথ্য-১

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ج إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ج إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ.

অর্থঃ (হে নবী,) বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের আত্মার ওপর যুলুম (অত্যাচার) করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন বা করবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ফিরে এস তোমাদের রবের দিকে এবং পরিপূর্ণরূপে তাঁর অনুগত হয়ে যাও তোমাদের উপর আযাব আসার পূর্বে। তখন তোমরা কোন দিক থেকে সাহায্য পাবে না। (যুমার : ৫৩, ৫৪)

অসতর্ক ব্যাখ্যা ও তার পর্যালোচনা : আল-কুরআনে নিজ আত্মার উপর যুলুম করা বান্দাদের বুঝাতে আল্লাহ গুনাহগার মু'মিন বান্দাদের বুঝিয়েছেন। কারণ, তারা কোন গুনাহের কাজ করতে বাধ্য হলে মনে অনুশোচনা বা দুঃখ নিয়ে তথা মনের উপর যুলুম করে তা করে। ৫৩ নং আয়াতখানির ব্যাখ্যা করে তাই কেউ কেউ বলেছেন বা বলেন যে, আল্লাহ এ আয়াতে গুনাহগার মু'মিনদের প্রথমে তার গুনাহ মাফের রহমত থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন এবং পরে তাদের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন বলে জানিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, যেকোন ধরনের গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনদের পরকালে, হয় প্রথমেই গুনাহ মাফ করে দিয়ে তিনি বেহেশতে পাঠিয়ে দিবেন অথবা গুনাহের জন্যে কিছু দিন জাহান্নাম খাটার পর মাফ করে দিয়ে চিরকালের জন্যে বেহেশত দিয়ে দিবেন।

আয়াতের এ ধরনের ব্যাখ্যা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ-

ক. ৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ আবশ্যই বলেছেন তিনি গুনাহগার মু'মিনদের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন কিন্তু সে মাফ পাওয়ার জন্যে কী করতে হবে তা তিনি বলে দিয়েছেন পরের (৫৪ নং) আয়াতে। সেখানে তিনি তাঁর দিকে ফিরে আসতে এবং পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন গুনাহগার মু'মিনদের সকল গুনাহ তিনি মাফ করে দিবেন যদি তারা (অন্তত মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে খালিস নিয়াতে তওবা করে) পরিপূর্ণভাবে ইসলামে ফিরে আসে। সুতরাং

এ আয়াতে আল্লাহ যে গুনাহ মাফের কথা বলেছেন সেটি দুনিয়ার জীবনের কথা, পরকালের জীবনের কথা নয়।

খ. এ ব্যাখ্যা আল-কুরআনের অনেক আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী হয়। সেখানে বলা হয়েছে একটিও কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনকে চিরকাল দোযখে থাকতে হবে। আর অন্য গুনাহ নিয়ে মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের গুনাহ মাফ করে দিয়ে আল্লাহ প্রথম থেকে বেহেশত দিয়ে দিবেন।

প্রকৃত ব্যাখ্যা: এখানে দয়ালু আল্লাহ, গুনাহগার মু'মিনদের তার গুনাহ মাফের ব্যাপারে প্রথমে নিরাশ না হতে বলেছেন। তারপর জানিয়ে দিয়েছেন তিনি তাদের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন, তবে সে মাফ পেতে হলে তাদেরকে (অন্তত মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে খালিস নিয়াতে কৃত কবীরা গুনাহ থেকে তওবা করে) পরিপূর্ণ ইসলামে ফিরে আসতে হবে। সবশেষে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন শাস্তি এসে গেলে অর্থাৎ তার শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেলে সে শাস্তি থেকে কোনভাবেই তারা আর বাঁচতে পারবে না।

তথ্য-২

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ.

অর্থ: অতঃপর অণু পরিমাণ সৎ কাজও যে করেছে, সে তা দেখে নেবে এবং অণু পরিমাণ গুনাহের কাজও যে করেছে, সে তা দেখে নেবে।

(যিলযাল : ৭,৮)

অসতর্ক ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা : এ আয়াত দু'খানির ব্যাখ্যায় অনেকে লিখেছেন, বিন্দু পরিমাণ সৎ কাজ করলে মানুষ পরকালে তার পুরস্কার পাবে। আর বিন্দু পরিমাণ গুনাহ করলেও মানুষ পরকালে তার শাস্তি পাবে। এ ব্যাখ্যা থেকে যে তথ্য মুসলিম সমাজে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে তা হচ্ছে– মু'মিন ব্যক্তি কিছু নেকী ও কিছু গুনাহ নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে, গুনাহের পরিমাণ মত সময় দোযখের শাস্তি খেটে কৃত নেকীর পুরস্কারস্বরূপ চিরকালের জন্যে বেহেশত পেয়ে যাবে। আয়াত দু'খানির এ ব্যাখ্যা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ–

ক. আয়াত দু'খানিতে পুরস্কার বা শাস্তির কথা ঘুণাক্ষরেও বলা হয়নি। বলা হয়েছে বিন্দু পরিমাণ নেকী বা গুনাহ 'দেখানোর' কথা। অর্থাৎ মানুষের কৃত বিন্দু পরিমাণেরও নেকী ও গুনাহ পরকালে দেখান হবে।

খ. এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হলে সকল মু'মিনকেই কিছুকালের জন্যে দোযখ খাটতে হবে। কারণ, জীবনে কোন গুনাহ করেনি এমন মু'মিন নেই।

গ. আল-কুরআনের অনেক স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী হবে। কারণ, সেখানে বলা হয়েছে একটিমাত্র কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনকেও চিরকাল দোযখে থাকতে হবে। আর অন্য গুনাহ নিয়ে মৃত্যুবরণকারী মু'মিন প্রথম থেকেই বেহেশত পেয়ে যাবে।

প্রকৃত ব্যাখ্যাঃ ভিডিও (VIDEO) রেকডিং এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর আয়াত দু'খানির ব্যাখ্যা বুঝা সহজ হয়ে গেছে। এখন বুঝা যাচ্ছে মানুষের চব্বিশ ঘণ্টার ছোট-বড় সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহর কর্মচারীরা (ফেরেশতা) ভিডিও বা আরো উন্নতমানের যন্ত্রের দ্বারা রেকর্ড করে রাখছেন। শেষ বিচারের দিন, বিচারের রায়ের ব্যাপারে মানুষের মনে যাতে কোন সন্দেহ না থাকে সে জন্যে ঐ ভিডিও রেকর্ড দেখান হবে। ঐ ভিডিও রেকর্ডে মানুষ তার কৃত বিন্দু পরিমাণের সৎ কাজ যেমন দেখতে পাবে তেমনই দেখতে পাবে তার কৃত বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজও। এ তথ্যটাই আল্লাহ প্রসিদ্ধ এ আয়াত দু'খানির মাধ্যমে জানিয়েছেন। ভিডিও রেকর্ডিং এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগে আয়াত দু'খানির সঠিক ব্যাখ্যা করা অসম্ভব ছিল। আর তাই পূর্বের তাফসীরে আয়াত দু'খানির বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে।

তথ্য-৩

يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ج فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. فَأَمَّا
الَّذِيْنَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيرٌ وَّشَهِيقٌ. خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَا
دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ط إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا

يُرِيْدُ. وَأَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ط عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ.

অর্থ: সে দিন যখন আসবে তখন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। অতঃপর কিছু লোক হবে হতভাগ্য এবং কিছু লোক হবে সৌভাগ্যবান। যারা হতভাগ্য হবে তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে অবস্থান করবে যতদিন আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে। অবশ্য তোমার রব (কারো ব্যাপারে) অন্যরকম চাইলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই তোমার রব যা ইচ্ছা তা করবার অধিকার রাখেন।

আর যারা সৌভাগ্যবান তারা বেহেশতে যাবে এবং সেখানেই তারা অবস্থান করবে, যতদিন পর্যন্ত আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার রব (কারো ব্যাপারে) অন্যরকম চাইলে ভিন্ন কথা। তারা এমন প্রতিদান লাভ করবে, যার ধারাবাহিকতা ছিন্ন হবে না। (হূদ : ১০৫-১০৮)

অসতর্ক ব্যাখ্যা ও তার পর্যালোচনা : ১০৬ ও ১০৭ নং আয়াত দু'খানিতে আল্লাহ বলেছেন 'যারা হতভাগ্য হবে তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। অবশ্য তোমার রব কারো ব্যাপারে অন্যরকম চাইলে ভিন্ন কথা'। কোন কোন তাফসীরকারক 'অবশ্য তোমার রব কারো ব্যাপারে অন্যরকম চাইলে ভিন্ন কথা' (إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ) অংশটুকুর ব্যাখ্যা করে বলেছেন– দোযখে যাওয়া দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে যারা গুনাহগার মু'মিন হবে, গুনাহের সমপরিমাণ সময় দোযখের শাস্তি ভোগ হয়ে গেলে আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় তাদেরকে বেহেশতে পাঠিয়ে দিবেন।

এ ব্যাখ্যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ–

ক. এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হলে পরের আয়াত (১০৮ নং) যেখানে আল্লাহ বলেছেন 'সৌভাগ্যবানগণ বেহেশতে যাবে এবং সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। অবশ্য তোমার রব কারো ব্যাপারে অন্যরকম চাইলে ভিন্ন কথা' তার ব্যাখ্যা করে বলতে হবে– 'যারা বেহেশতে যাবে তাদের মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তিকে নেকীর সমপরিমাণ সময় বেহেশতে থাকার পর আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় বের

করে দোযখে পাঠিয়ে দিবেন।' এ বক্তব্য কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য বক্তব্যের স্পষ্ট বিরোধী।

খ. প্রথম আয়াতখানিতে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, আয়াত ক'টিতে উল্লিখিত ঘটনাগুলো ঘটবে তথা আল্লাহর সিদ্ধান্ত গুলো বাস্তবায়িত হবে পরকালে বিচার-ফয়সালা হওয়া দিনটির সময়ের মধ্যে, কিছুকাল দোযখ বা বেহেশত ভোগ করার পরে নয়।

গ. এ ব্যাখ্যা কুরআনের অনেক আয়াতের বক্তব্যের বিরোধী হবে। কারণ, সেখানে বলা হয়েছে– একটিও কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনকে চিরকাল দোযখে থাকতে হবে। আর অন্য গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনদের গুনাহ মাফ করে দিয়ে আল্লাহ প্রথম থেকেই বেহেশত দিয়ে দিবেন।

প্রকৃত ব্যাখ্যা: সে দিন অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। আর পৃথিবীর সকল মানুষ সে দিন বিচার-ফয়সালার মাধ্যমে হতভাগ্য ও সৌভাগ্যবান এ দু'ভাগে বিভক্ত হবে। হতভাগ্যদের দোযখে পাঠানো হবে। সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। চিরকাল তারা সেখানে থাকবে। ঐ হতভাগ্যদের মধ্যে শুধু বিভিন্ন ধরনের (সাধারণ, তাগুত ও মুনাফিক) কাফিরদের থাকার কথা কিন্তু আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় তথা নিজ তৈরি ও কুরআন-সুন্নাহের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া নীতিমালা অনুযায়ী, কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনদেরও চিরকালের জন্যে দোযখে থাকার শাস্তি দিবেন। নিশ্চয়ই তোমার রব সকল বিষয়ে ন্যায়ভিত্তিক নীতিমালা তৈরির ক্ষমতা রাখেন।

আর যারা বিচারে সৌভাগ্যবান বলে প্রতীয়মান হবে, তাদের তিনি চিরকালের জন্যে বেহেশতে পাঠিয়ে দিবেন। তাদের মধ্যে শুধু নেককার মু'মিনদেরই থাকার কথা কিন্তু তোমার রব নিজ ইচ্ছায় তথা নিজ তৈরি করা ও জানিয়ে দেয়া নীতিমালা অনুযায়ী কবীরা গুনাহ ছাড়া অন্য গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনদেরও ঐ পুরস্কার দিবেন। তাদের পুরস্কারও চিরস্থায়ী হবে।

তথ্য-৪

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ
الْإِنْسِ ط وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ

وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيْ أَجَّلْتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِيْنَ فِيْهَا
إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ؕ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ.وَكَذٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ
الظَّالِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

অর্থ: যে দিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ এইসব লোককে একত্রিত করবেন সে দিন তিনি (শয়তান) জিনদের বলবেন, হে জিনসমাজ, তোমরা তো মানুষদের মধ্যে অনেককে অনুগামী করে নিয়েছিলে। তাদের মানব বন্ধুরা বলবে, হে আল্লাহ, আমরা পরস্পরের দ্বারা ফায়দা লুটেছি এবং এখন আমরা সে সময়ে পৌঁছে গেছি যা আপনি আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। আল্লাহ বলবেন, এখন তোমাদের পরিণাম জাহান্নাম। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ (কারো ব্যাপারে) অন্য রকম ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই তোমাদের রব সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞ। এমনিভাবে আমি (পরকালে) যালিমদের বিভিন্ন দলকে (Division) পরস্পরের সঙ্গী বানিয়ে দিব, তাদের কৃত কর্মের কারণে।

(আন-আম : ১২৮, ১২৯)

আয়াত দু'খানির অসতর্ক ব্যাখ্যা ও তার পর্যালোচনা : প্রথম আয়াতখানির إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ অর্থাৎ 'আল্লাহ কারো ব্যাপারে অন্যরকম চাইলে ভিন্ন কথা'- অংশটুকুর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ করেছেন, যারা দোযখে যাবে তাদের মধ্যে যারা মু'মিন হবে, কিছুকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহ্ তাদের যে কোন উপায়ে বের করে এনে চিরকালের জন্যে বেহেশতে পাঠিয়ে দিবেন। আর ২নং তথ্যের অসতর্ক ব্যাখ্যার ন্যায় এ ব্যাখ্যাটিও ব্যাপক প্রচার পেয়েছে। আয়াত দু'খানির এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ-

ক. আয়াত দু'খানির আগে কয়েকটি আয়াতের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, ১২৮ নং আয়াতে কাফের ব্যক্তিদের সামনে রেখে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে। আবার শুধুমাত্র ১২৮ নং আয়াতের বক্তব্য পর্যালোচনা করলেও বুঝা যায়, বক্তব্যটি করা হয়েছে কাফির ব্যক্তিদের ব্যাপারে। কারণ, যে সকল ব্যক্তি জেনে বুঝে ইচ্ছা করে শয়তানকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে পরস্পরের সহায়তায় দুনিয়ায় ফায়দা লুটেছিল তারা মু'মিন হতে পারে না। তাই আয়াতের শুরুতে যাদের ঠিকানা দোযখ বলা হয়েছে, তারা

কাফির ব্যক্তি। সুতরাং ঐ কাফির ব্যক্তিদের মধ্য হতে কাউকে কিছুকাল পর বের করে এনে আল্লাহ বেহেশত দিয়ে দিবেন তা হতে পারে না।

খ. প্রথম আয়াতের শুরুতেই আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, আয়াত দু'খানিতে উপস্থাপনা করা আল্লাহর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হবে শেষ বিচারের দিনটির সময়সীমার মধ্যে। কিছুকাল দোযখ খাটার পরে নয়।

গ. এ ব্যাখ্যা কুরআনের অনেক আয়াতের বক্তব্যের স্পষ্ট বিরুদ্ধ। কারণ, সেখানে বলা হয়েছে কাফির বা কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনরা দোযখে যাবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে। আর অন্য ধরনের গুনাহগার মু'মিনদের দোযখে যেতে হবে না। আল্লাহ প্রথমেই তাদের গুনাহ মাফ করে দিয়ে বেহেশত দিয়ে দিবেন।

প্রকৃত ব্যাখ্যাঃ আয়াত দু'খানির প্রকৃত ব্যাখ্যা বুঝতে হলে প্রথমে জেনে নিতে হবে যে, শেষ বিচারে দিন, যালিম তথা অত্যাচারী ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করে বিচার করা হবে কাফির এবং বড় গুনাহগার হিসেবে মৃত্যুবরণকারী মু'মিনকে। কারণ, একজন কাফিরের বড় অপরাধের দ্বারা মানুষের যে পরিমাণ ক্ষতি হয় একজন মু'মিনের বড় অপরাধের দ্বারাও মানুষের একই ক্ষতি হয়। বড় গুনাহগার মু'মিন হিসেবে মৃত্যুবরণকারী মু'মিনকে যে পরকালে যালিম হিসেবে গণ্য করে বিচার করা হবে সেটি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُوْنُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلاَ تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ ط بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ.

অর্থঃ হে মু'মিনগণ কোন পুরুষ অপর কোন পুরুষকে উপহাস করবে না, কেননা সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আবার কোন নারীও

অপর কোন নারীকে উপহাস করবে না, কেননা সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। নিজেদের মধ্যে একে অপরের দোষ খুঁজে বেড়িও না এবং অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান আনার পর (মু'মিন ব্যক্তির) গুনাহগার নামে আখ্যায়িত হওয়া (গুনাহের কাজ করা) অত্যন্ত বড় অপরাধ (কবীরা গুনাহ)। যারা (যে সকল মু'মিন ব্যক্তি) এ ধরনের আচার-আচরণ হতে তওবা করবে না তারাই যালিম।(হুজুরাত : ১১)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে মু'মিন ব্যক্তিদের কিছু আচার-আচরণ তথা উপহাস করা, দোষ খুঁজে বেড়ান ও খারাপ নামে ডাকা থেকে বিরত থাকতে বলার পর ঐ ধরনের আচার-আচরণ করা কবীরা গুনাহ বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর আল্লাহ বলেছেন, যারা ঐ ধরনের আচরণ থেকে তওবা করবে না তারা যালিম। অর্থাৎ আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যারা কৃত কবীরা গুনাহ মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত সময়পূর্বে তওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের পরকালে যালিম ধরে বিচার-ফয়সালা করা হবে।

❑❑ উপরের তথ্য সামনে রাখলে আয়াতে কারীমার (إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ) 'আল্লাহ্ যাদের ব্যাপারে অন্য রকম চান তাদের কথা ভিন্ন' অংশটুকুর প্রকৃত ব্যাখ্যা বুঝা কঠিন নয়। আল্লাহ্ এখানে বলেছেন, শেষ বিচারের দিন তিনি শয়তানের বন্ধু যালিম-কাফিরদের চিরকাল দোযখে থাকার শাস্তি দিবেন। ঐ ধরনের শাস্তি শুধু কাফিরদের পাওয়ার কথা কিন্তু তিনি নিজ ইচ্ছায় তথা নিজ তৈরি ও জানিয়ে দেয়া নীতিমালা অনুযায়ী, কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনদেরও ঐ ধরনের শাস্তি দিবেন। এ ব্যাখ্যা যে সঠিক হবে তার প্রমাণ হচ্ছে পরের (১২৯ নং) আয়াতখানি। যেখানে আল্লাহ বলেছেন, 'এভাবে আমি এক ধরনের যালিমদের অন্য ধরনের যালিমদের সঙ্গে একত্রিত করে দিব, তাদের কৃতকর্মের কারণে।' অর্থাৎ আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন শেষ বিচারের দিন তিনি কাফির ও মু'মিন বিভাগের যালিমদের, তাদের কৃতকর্মের জন্যে, একই ধরনের শাস্তি দিয়ে জাহান্নামে পরস্পরের সঙ্গী বানিয়ে দিবেন।

গ. কিছু বর্ণনা, যা রাসূল (সা.) এর বক্তব্য বলে চালু আছে

চলুন এখন উল্লেখ ও পর্যালোচনা করা যাক সে বর্ণনাগুলো যা রাসূল (সা.) এর বক্তব্য বলে ব্যাপকভাবে চালু আছে এবং সেগুলো 'কিছু দিন দোযখে

থেকে শাফায়াতের মাধ্যমে চিরকালের জন্যে বেহেশত পাওয়া যাবে' এ ধারণা মুসলমান সমাজে চালু হওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে। বড় তথ্যগুলোর শুধুমাত্র আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অংশটুকু উল্লেখ করা হল–

তথ্য-১

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهَمُّونَ بِذَلِكَ
فَيَقُولُونَ لَو اسْتَشْفَعْنَا اِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ
عَلَيْهِ السَّلَامِ فَيَقُولُونَ ... ... قَالَ فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ
عَلَى رَبِّي فِيْ دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ
سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِىْ فَيَقُوْلُ ارْفَعْ يَا مُحَمَّدُ
وَقُلْ تُسْمَعْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهُ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِىْ
عَلَى رَبِّىْ بِثَنَاءٍ وَبِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا
فَاَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الثَّانِيَةَ
فَاَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّىْ فِىْ دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِىْ عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ
سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّدَعَنِىْ ثُمَّ يَقُوْلُ ارْفَعْ يَامُحَمَّدُ
وَ قُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي
فَأُثْنِىْ عَلَى رَبِّىْ بِثَنَاءٍ وَبِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي
حَدًّا فَاَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ... ...
حَتَّى مَا يَبْقَى فِىْ النَّارِ اِلاَّ مَنْ قَدْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ
عَلَيْهِ الْخُلُودُ... ... ... متفق عليه.

অর্থ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের (হাশরের ময়দানে) আটক করে রাখা হবে। এমন কি এতে তারা অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ও অস্থির হয়ে পড়বে এবং বলবে, যদি আমরা আমাদের রবের কাছে কারো দ্বারা সুপারিশ করাই তা হলে হয়তো

আমাদের বর্তমান অবস্থা হতে মুক্তি লাভ করে আরাম পেতে পারি। তাই তারা হযরত আদম (আ.) এর কাছে যাবে এবং বলবে–[এরপর হাদীসখানির অনেকাংশ জুড়ে উল্লেখ করা হয়েছে, ঈমানদারগণ পর পর আদম (আ.), নূহ (আ.), ইব্রাহীম (আ.), মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.) এর নিকট যাবেন। তাঁরা সকলেই তাঁদের দুর্বলতা উল্লেখ করে শাফায়াতের ব্যাপারে তাঁদের অপারগতা প্রকাশ করবেন। শেষে ঈসা (আ.) তাঁদের মুহাম্মাদ (সা.) এর নিকট যেতে বলবেন। মুহাম্মাদ (সা.) এর নিকট গেলে তিনি যা বলেছেন বা বলবেন, সে কথাগুলো হল]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তারা আমার কাছে আসবে, তখন আমি আমার রবের কাছে তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব, আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। আমি যখন তাঁকে দেখব, তখনই তাঁর উদ্দেশে সিজদায় পড়ে যাব, আল্লাহ আমাকে যতক্ষণ চাইবেন এই অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও এবং বল, তোমার কথা শোনা হবে। তুমি সুপারিশ কর, তা কবুল করা হবে। প্রার্থনা কর, যা চাইবে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তখন আমি মাথা উঠাব এবং আমার রবের এমনভাবে প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করব, যা তিনি সে সময় আমাকে শিখিয়ে দিবেন। অতঃপর আমি শাফায়াত করব কিন্তু এই ব্যাপারে আমার জন্যে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। তখন আমি আল্লাহর দরবার হতে উঠে আসব এবং ঐ নির্দিষ্ট সীমার লোকদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

[এরপর হাদীসখানির অনেকটি অংশ জুড়ে একই বর্ণনাসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে রাসূল (সা.) মোট ৩ বার আল্লাহর অনুমতি নিয়ে দোযখে যাবেন এবং প্রত্যেক বারই বেশ কিছু দোযখীকে বের করে আনবেন] তারপর হাদীসখানিতে বলা হয়েছে-

অবশেষে কুরআন যাদেরকে আটকিয়ে রাখবে (যাদের জন্যে কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী চিরস্থায়ী দোযখবাস নির্ধারিত হয়ে গেছে,) তারা ব্যতীত আর কেউ দোযখে থাকবে না। ……… (বুখারী, মুসলিম)

তথ্য-২

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَيَأْتُوْنَ آدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ اشْفَعْ اِلَى رَبِّكَ ... ...

فَيَأْتُوْنِيْ فَاَقُوْلُ اَنَا لَهَا فَاَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّيْ فَيُؤْذَنُ لِيْ وَ يُلْهِمُنِيْ مَحَامِدَ اَحْمَدُهُ بِهَا لاَ تَحْضُرُنِيْ الاٰنَ فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَاَخِرُّلَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ شَعِيْرَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَنْطَلِقُ فَاَفْعَلُ ثُمَّ ... ...

فَاَقُوْلُ يَارَبِّ ائْذَنْ لِّيْ فِيْمَنْ قَالَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ وَلَكِنْ وَ عِزَّتِيْ وَ جَلاَلِيْ وَكِبْرِيَائِيْ وَ عَظْمَتِيْ لَاُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ. متفق عليه.

অর্থ: হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন মানুষ সমবেত অবস্থায় উদ্বেলিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে। তাই তারা সকলে হযরত আদম আ. এর কাছে যেয়ে বলবে, আমাদের জন্যে আপনার রবের কাছে শাফায়াত করুন।

(এরপর হাদীসখানির কিছু অংশ জুড়ে বলা হয়েছে, লোকেরা আদম আ. এর পর ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা আ. এর নিকট শাফায়াতের জন্যে অনুরোধ করবে। কিন্তু তাঁদের সকলে নিজেদের দুর্বলতা দেখিয়ে সে ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করবেন। শেষে ঈসা আ. তাদেরকে মুহাম্মাদ সা. এর নিকট যেতে বলবেন। মুহাম্মদ সা. এর নিকট গেলে তিনি বলবেন)। তখন তারা সকলে আমার কাছে আসবে। আমি বলব, আমিই এই কাজের জন্যে। এবার আমি আমার রবের কাছে অনুমতির প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। এ সময় আমাকে প্রশংসা ও স্তুতির এমন সব বাণী ইলহাম করা হবে, যা এখন আমার জানা নেই। আমি ঐ সব প্রশংসা দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করব এবং তাঁর উদ্দেশে সেজদায় পড়ে যাব। তখন বলা

হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার বক্তব্য শোনা হবে। প্রার্থনা কর, যা চাইবে তা দেয়া হবে। আর শাফায়াত কর, কবুল করা হবে। তখন আমি বলব, হে রব! আমার উম্মত, আমার উম্মত! (অর্থাৎ আমার উম্মতের উপর রহম করুন, আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন) বলা হবে, যাও, যাদের অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে দোযখ হতে বের করে আন। তখন আমি গিয়ে তাই করব।

(এরপর হাদীসখানিতে একই বর্ণনা ভঙ্গিতে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূল সা. মোট ৪ বার সেজদায় যেয়ে আল্লাহর নিকট উম্মতের জন্যে দোয়া করবেন। ২য় বারে আল্লাহর অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে যে সকল মানুষের অন্তরে অণু বা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাদের তিনি দোযখ থেকে বের করে আনবেন। ৩য় বার অনুমতি পেয়ে তিনি যাদের অন্তরে ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে আনবেন। আর ৪র্থ বার অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে তিনি বলবেন) হে রব! যারা শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, আমাকে তাদের জন্যও শাফায়াত করার অনুমতি দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমার ইজ্জত ও জালাল এবং আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কসম করে বলছি, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, আমি নিজেই তাদেরকে দোযখ হতে বের করব। (বুখারী, মুসলিম)

তথ্য-৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيْقُوْنَ فَيَقُوْلُ النَّاسُ أَلاَ تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَّشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَأْتُوْنَ آدَمَ وَ ذَكَرَ حَدِيْثَ الشَّفَاعَةَ ... ...

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু গোশত আনা হল এবং তাঁর খেদমতে

বাজুর গোশতটিই পেশ করা হল। মূলত তিনি এই গোশত খেতে বেশি পছন্দ করতেন। কাজেই তিনি তা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলেন। তারপর বললেন, কিয়ামতের দিন আমি হব সমস্ত মানুষের সর্দার। যে দিন মানবমণ্ডলী রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে এবং সূর্য থাকবে খুব কাছে। পেরেশানি ও দুশ্চিন্তায় মানুষ এমন এক করুণ অবস্থায় পৌঁছবে, যা সহ্য করার শক্তি তাদের থাকবে না। তখন তারা (অস্থির হয়ে পরস্পরে) বলাবলি করবে, তোমরা কি এমন কোন ব্যক্তিকে খোঁজ করে পাও না, যিনি তোমাদের রবের কাছে তোমাদের জন্যে সুপারিশ করবেন? তখন তারা হযরত আদম (আ.) এর কাছে আসবে। এর পর বর্ণনাকারী হযরত আবু হোরায়রা (রা.) ২ নং তথ্যের হাদীসখানির ন্যায় শাফায়াত সম্বন্ধে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য বর্ণনা করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

তথ্য-৪

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ ... ...

حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُّخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُّخْرِجَهُ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُّخْرِجُوْا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ

... ...

অর্থ: হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ... ...

অবশেষে যখন আল্লাহ্ বান্দাদের বিচার-ফয়সালা শেষ করবেন এবং (নিজের দয়া অনুগ্রহে) কিছু সংখ্যক ঐ ধরনের দোযখবাসীকে নাজাত দেয়ার ইচ্ছা করবেন, যারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, তখন ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ করবেন, যারা একমাত্র আল্লাহ্‌র এবাদত করেছে, তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে আন। তখন তারা ঐ সব লোকের কপালে সেজদার চিহ্ন দেখে শনাক্ত করবেন এবং দোযখ হতে বের করে আনবেন। আর আল্লাহ্ তায়ালা সেজদার চিহ্নসমূহ পোড়ানো আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। ফলে দোযখে নিক্ষিপ্ত প্রতিটি আদম সন্তানের সেজদার স্থানটি ব্যতীত গোটা দেহটি আগুন জ্বালিয়ে ফেলবে। তাই তাদেরকে এমন অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় দোযখ হতে বের করা হবে যে, তারা একেবারে কাল কয়লা হয়ে গিয়েছে। তখন তাদের উপর সঞ্জীবনী পানি ঢেলে দেয়া হবে। এর ফলে তারা এমনভাবে তরতাজা ও সজীব হযে উঠবে, যেমন কোন বীজ প্রবহমান পানির ধারে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। ... ... (বুখারী, মুসলিম)

তথ্য-৫

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ. رواه البخارى وَ فِيْ رِوَايَةٍ يُخْرَجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِيْ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِيْ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ.

অর্থঃ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, একদল মানুষকে মুহাম্মাদ (সা.) এর শাফায়াতে জাহান্নাম হতে বের করা হবে। অতঃপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের নাম রাখা হবে জাহান্নামী। (আবু দাউদ)

অপর এক বর্ণনায় আছে- রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের একদল লোক আমার সুপারিশে জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ করবে। তাদেরকে জাহান্নামী নামে ডাকা হবে।

أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ ... ...

ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوشٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمِ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيُصَلُّوْنَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ فَيَقُوْلُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ

النَّبِيُّوْنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوْا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيْهِمْ فِي نَهَرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيْوةِ فَيَخْرُجُوْنَ كَمَا تَخْرُجُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هٰؤُلاَءِ عُتَقَاءُ اللهِ الَّذِيْنَ أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ.

অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, একদা কতিপয় লোক জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ।... ... ... অতঃপর জাহান্নামের ওপর দিয়ে পুলসিরাত পাতা হবে এবং শাফায়াতের অনুমতি দেয়া হবে। তখন নবী-রাসূলগণ (স্ব স্ব উম্মতের জন্যে) এই ফরিয়াদ করবেন, হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখ। মু'মিনগণ পুলসিরাতের ওপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ পাখির গতিতে এবং কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে আবার কেউ উটের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ সহীহ-সালামতে বেঁচে যাবে। আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে, তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হবে এবং কেউ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে জাহান্নামে পড়বে। অবশেষে মু'মিনগণ জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি লাভ করবে। সে মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের প্রত্যেকে নিজের হক বা অধিকারের দাবিতে কত কঠোর, তা তো তোমাদের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ তাদের সেই সমস্ত ভাইকে মুক্তির জন্যে আল্লাহর সাথে আরও অধিক ঝগড়া করবে, যারা তখনও দোযখে পড়ে রয়েছে। তারা বলবে, হে আমাদের রব! এই সমস্ত লোক আমাদের সাথে রোজা রাখত, নামাজ পড়ত এবং হজ আদায় করত। (সুতরাং তুমি তাদেরকে নাজাত দাও)।

তখন আল্লাহ্ বলবেন, যাও, তোমরা যাদেরকে চিন তাদেরকে দোযখ হতে মুক্ত করে আন। তাদের চেহারা-আকৃতি পরিবর্তন করা দোযখের আগুনের ওপর হারাম করা হয়েছে। (তাই জান্নাতে প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত লোকেরা তাদের জাহান্নামবাসী ভাইদেরকে দেখে চিনতে পারবে)। তখন তারা দোযখ হতে বহু সংখ্যক লোককে বের করে আনবে। অতঃপর বলবে, হে আমাদের রব! এখন সেখানে এমন আর একজন লোকও অবশিষ্ট নেই যাদেরকে বের করার জন্যে আপনি নির্দেশ দিয়েছেন। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আবার যাও, যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদের সকলকে বের করে আন। এতেও তারা বহু সংখ্যক লোককে বের করে আনবে। তারপর আল্লাহ্ বলবেন, পুনরায় যাও, যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদের সবাইকে বের করে আন! সুতরাং এতেও তারা বহু সংখ্যককে বের করে আনবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, আবার যাও, যাদের অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান পাবে তাদের সকলকেও বের করে আন। এবারও তারা বহু সংখ্যককে বের করে আনবে এবং বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! ঈমানদার কোন ব্যক্তিকেই আমরা আর জাহান্নামে রেখে আসিনি। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, ফেরেশতাগণ, নবীগণ এবং মু'মিনীন সকলেই শাফায়াত করেছে, এখন এক 'আরহামুর রাহেমীন' তথা আমি পরম দয়ালু ব্যতীত আর কেউই অবশিষ্ট নেই। এই বলে তিনি মুষ্টিভরে এমন একদল লোককে দোযখ হতে বের করবেন যারা কখনও কোন নেক কাজ করেনি। যারা জ্বলে-পুড়ে কাল কয়লা হয়ে গেছে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতের সম্মুখ ভাগের একটি নহরে ঠেলে দেয়া হবে, যার নাম 'নহরে হায়াত'। এতে স্রোতের ধারে যেমনিভাবে ঘাসের বীজ গজায়, তেমনিভাবে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গজাবে। তারা তা হতে বের হয়ে আসবে মুক্তার মত (চকচকে অবস্থায়)। তাদের ঘাড়ে সীলমোহর থাকবে। জান্নাতবাসীগণ তাদেরকে দেখে বলবে, এরা পরম দয়ালু আল্লাহর আযাদকৃত। আল্লাহ্ তায়ালা এদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। অথচ পূর্বে এরা কোন নেক আমল করেনি। অতঃপর

তাদেরকে বলা হবে, এই জান্নাতে তোমরা যা দেখছ, তা তোমাদেরকে দেয়া হল এবং এতদসঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ আরও দেয়া হল।

(বুখারী, মুসলিম)

তথ্য-৭

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً فَيَقُوْلُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لاَ أَرَاهَا هَا هُنَا فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

অর্থঃ হযরত আবু যর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত আছি, যে জান্নাতীদের মধ্যে সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সর্বশেষ জাহান্নামী, যে তা হতে বের হয়ে আসবে। কিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। তখন ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, তার ছোট ছোট গুনাহ তার সম্মুখে উপস্থিত কর এবং বড় বড় গোনাহ দূরে রাখ। তখন তার ছোট ছোট গুনাহ তার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আচ্ছা বল তো, অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজটি তুমি করেছিলে? সে বলবে, হ্যাঁ, করেছি। বস্তুত তা সে অস্বীকার করতে পারবে না। তবে তার বড় বড় গোনাহ উপস্থিত করা সম্পর্কে সে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। তখন তাকে বলা হবে, যাও! তোমার প্রতিটি গুনাহের স্থলে এক একটি নেকী

দেয়া হল। তখন সে বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি তো এমন কিছু (বড় বড়) গুনাহও করেছিলাম, যেগুলোকে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না। বর্ণনাকারী হযরত আবু যর (রা.) বলেন, এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। (মুসলিম)

তথ্য-৮

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي. رواه الترمذى و ابو داود و رواه ابن ماجة عن جابر.

অর্থ: হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীগণই বিশেষভাবে আমার শাফায়াত লাভ করবে। (তিরমিযী ও আবু দাউদ। আর ইবনে মাজাহ হযরত জাবের রা. হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

❑❑ এ ধরনের আরো কিছু বর্ণনা হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ থাকতে পারে।

হাদীস বলে চালু হওয়া এ বর্ণনাগুলোর পর্যালোচনা

এ ধরনের আরো হাদীস, হাদীসের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ থাকতে পারে। হাদীসগুলো থেকে বুঝা যায়, কবীরা গুনাহ বা যে কোন গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনদের গুনাহের ধরন ও পরিমাণ অনুযায়ী কিছুকাল দোযখ ভোগ করার পর কোন না কোনভাবে (শাফায়াত বা নিজ ইচ্ছায়) বের করে এনে আল্লাহ চিরকালের জন্যে বেহেশত দিয়ে দিবেন।

হাদীসগুলো পর্যালোচনার সময় মনে রাখতে হবে হাদীস শাস্ত্রে হাদীস বলতে বুঝানো হয়েছে, রাসূল সা. এর পরের ৪ (চার) স্তরের (সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী, তাবে তাবে-তাবেয়ী) ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের রাসূল সা. এর কথা, কাজ বা সমর্থনের নিজ বুঝের স্বীয় ভাষায় বর্ণনা করা অথবা হুবহু (শাব্দিক) বর্ণনা করা বক্তব্যকে। তবে শাব্দিক বর্ণনা করা যেহেতু ভীষণ কঠিন তাই শাব্দিক বর্ণনার হাদীসের সংখ্যা মাত্র কয়েকটি। আর হাদীস শাস্ত্রে একটি হাদীসকে 'সহীহ' বলা হয় সনদ তথা

বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা ও গুণাগুণের (আদালত) ভিত্তিতে, বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। অর্থাৎ হাদীস শাস্ত্রে একটি হাদীসের সাথে 'সহীহ' শব্দটি যোগ করে বুঝানো হয়েছে যে, ঐ হাদীসখানির সকল স্তরের, বর্ণনাকারীগণ এমন যোগ্যতা (আদালত) সম্পন্ন যে তাদের পক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কোন বিষয়কে রাসূল সা. এর কথা, কাজ বা সমর্থন বলে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে হাদীস শাস্ত্রবিদগণ এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে রাসূল সা. এর কথা, কাজ ও সমর্থন বুঝতে এবং উপস্থাপন করতে বর্ণনাকারীদের ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। আর বাস্তবে সাহাবায়ে কিরামদেরও তা হয়েছে বিধায় রাসূল সা. এর কিছু কিছু কথা, কাজ বা সমর্থনের ব্যাপারে সাহাবীগণের বিপরীতধর্মী বক্তব্য হাদীস গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। এ কারণেই বক্তব্য বিষয়ের নির্ভুলতার ব্যাপারে ধারণা দেয়ার জন্যে হাদীস শাস্ত্রবিদগণ 'সহীহ হাদীসকে' আবার বর্ণনাকারীদের সংখ্যার ভিত্তিতে মুতাওয়াতির, মশহুর, আজিজ ও গরিব এ চার ভাগে ভাগ করেছেন।

মুতাওয়াতির সহীহ হচ্ছে সেই সহীহ হাদীস যার সকল স্তরে অসংখ্য বর্ণনাকারী রয়েছে। মশহুর সহীহ হচ্ছে সেটি যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন স্তরে তিনজনের কমে নামে নাই। যে সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন স্তরে দুইজন তাকে আজীজ সহীহ, আর যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন স্তরে একজন তাকে গরিব সহীহ হাদীস বলে। সহীহ হাদীসের এ ধরনের শ্রেণী বিভাগ থেকে হাদীসের বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতা সম্বন্ধে যা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে– মুতাওয়াতির সহীহ হাদীসের বক্তব্য প্রায় ১০০% নির্ভুল। কারণ, কোন একটি বিষয় অসংখ্য যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ ভুল বুঝবেন বা ভুল উপস্থাপন করবেন এটি হওয়া অসম্ভব। মশহুর সহীহ হাদীসের বক্তব্য নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা মুতাওয়াতির সহীহ হাদীসের চেয়ে কম। আজিজ সহীহ হাদীস নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা মশহুর সহীহ হাদীসের চেয়েও কম। আর গরিব সহীহ হাদীস নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আজিজ সহীহ হাদীসের চেয়েও কম।

সহীহ হাদীসের বক্তব্য বিষয়ের নির্ভুলতার ব্যাপারে হাদীস শাস্ত্রের উপরোক্ত দিক-নির্দেশনা জানার পর হাদীসের বক্তব্য বিষয় (মতন)

গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়ার যে নীতিমালা সহজেই বের হয়ে আসে বা বের করা যায় তা হচ্ছে–

১. যে হাদীসের বক্তব্য বিষয় (মতন) কুরআনের কোন স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী সে হাদীসের বর্ণনা সূত্র সহীহ হলেও তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী কথা, কাজ বা সমর্থন রাসূল সা. এর পক্ষে বলা বা করা সম্ভব নয়।

২. কোন সহীহ হাদীসের বক্তব্য অন্য কোন অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী সহীহ হাদীসের বক্তব্যের স্পষ্ট বিরোধী হলে সে বক্তব্য রহিত হবে তথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী শক্তিশালী হাদীস দুর্বল হাদীসের বিরোধী বক্তব্যকে রহিত করে।

৩. কোন সহীহ হাদীসের বক্তব্য সাধারণ মুসলিম বিবেকের স্পষ্ট বিরুদ্ধ হলে সে বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, রাসূল সা. নিজেই বলেছেন, মুসলিম বিবেক যে ব্যাপারে সায় দেয় সেটিই নেকী বা সঠিক। আর যে ব্যাপারে সায় দেয় না সেটি গুনাহ বা ভুল (এ হাদীসখানি পুস্তিকার তথ্যের উৎসের বিবেক-বুদ্ধি বিভাগে উল্লেখ করা হয়েছে)।

উসূলে হাদীসের এ নীতিমালার আলোকে চলুন এখন বর্ণনাসমূহকে পর্যালোচনা করা যাক। উল্লিখিত হাদীস বলে চালু হয়ে যাওয়া বর্ণনাসমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা–

ক. যে সকল বর্ণনায় বলা হয়েছে যাদের সামান্য পরিমাণও ঈমান আছে গুনাহের জন্যে কিছুকাল দোযখে শাস্তি ভোগ করার পর তাদের রাসূল (সা.) এর শাফায়াত বা আল্লাহর নিজ ইচ্ছায় দোযখ থেকে বের করে এনে চিরকালের জন্যে বেহেশতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

খ. যে সকল বর্ণনায় বলা হয়েছে কবীরা গুনাহকারী ঈমানদার দোযখীরাও শাফায়াত বা আল্লাহর নিজ ইচ্ছায় দোযখ থেকে বের হয়ে এসে চিরকালের জন্যে বেহেশতে যেতে পারবে।

গ. যে সকল বর্ণনায় বলা হয়েছে এমন লোকদেরও দোযখ থেকে বের করে এনে চিরকালের জন্যে বেহেশত দিয়ে দেয়া হবে যারা জীবনে কোন নেক আমল তথা সৎ কাজ করেনি।

সামান্য পরিমাণ ঈমান থাকা গুনাহ্‌গার ব্যক্তিরাও কিছু দিন দোযখের শাস্তি ভোগ করে শাফায়াতের মাধ্যমে চিরকালের জন্যে বেহেশত পাবে-এ ধরনের তথ্যসম্বলিত বর্ণনাসমূহের পর্যালোচনা

এ ধরনের তথ্যসম্বলিত বর্ণনাসমূহ কুরআন হাদীসের বক্তব্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরুদ্ধ। কারণ–

ক. আল-কুরআনের–

১. সূরা বাকারার ৮০ এবং আলে-ইমরানের ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কিছুকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করে বেহেশতে যাওয়ার ন্যায় কোন ঘটনা পরকালে ঘটবে না।

২. অসংখ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যারা দোযখে যাবে তারা চিরকালের জন্যে সেখানে থাকবে।

৩. সূরা যুমায়ের ১৯ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, বিচার করে তিনি যাদের দোযখে পাঠিয়ে দিবেন তাদের অন্য কেউ তো দূরের কথা স্বয়ং রাসূল (সা.) শাফায়াত করে সেখান থেকে উদ্ধার করতে পারবেন না।

৪. আল-কুরআনের কোথাও বলা নাই যে, শেষ বিচারের দিন কিছুকাল দোযখ ভোগ করে চিরকালের জন্যে বেহেশতে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে কোন রায় আল্লাহ দিবেন।

খ. যে সকল সহীহ হাদীসে রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘যারা ঈমানের ঘোষণা দিবে তারা বেহেশতে যাবে’ সেখানে আসলে তিনি বলেছেন, ‘যারা ঈমানের ঘোষণা দিবে এবং ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করবে তারা বেহেশতে যাবে।’ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছি ‘পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে বর্ণনাসম্বলিত হাদীসসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা’ নামক বইটিতে।

গ. বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ থাকা কয়েকটি সর্বোচ্চ শক্তিশালী হাদীস থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় যে-

১. যারা দোযখে যাবে তারা চিরকাল সেখানে থাকবে।

২. যে গুনাহগার মু'মিন দোযখে যাবে তাকে চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।

☐☐ তাই এ বর্ণনাসমূহ সংজ্ঞা অনুযায়ী সহীহ হাদীস হতে পারে তবে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ হাদীসকে সহীহ বলা হয় সনদের ত্রুটিহীনতার ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়।

ঈমানদার কবীরা গুনাহকারীরাও রাসূল (সা.) এর শাফায়াত বা আল্লাহর নিজ ইচ্ছার মাধ্যমে কিছুকাল দোযখ ভোগ করে চিরকালের জন্যে বেহেশত পাবে-এ তথ্যসম্বলিত বর্ণনাগুলোর পর্যালোচনা

এ ধরনের বর্ণনাসমূহের ব্যাপারে বলা যায়-

ক. প্রথম ধরনের বর্ণনার পর্যালোচনায় উল্লিখিত কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির সকল তথ্য এ তথ্যের অগ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে।

খ. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনরা চিরকাল দোযখে থাকবে বলে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির অনেক স্পষ্ট বক্তব্য আছে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ. সূরা শুরা ৩৬ ও ৩৭ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত মু'মিন ব্যক্তিরাই শুধু পরকালে বেহেশত পাবে।

☐☐ তাই এ বর্ণনাগুলোও রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হিসেবে কোন মতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

যারা জীবনে কোন নেক আমল করেনি, তাদেরকেও আল্লাহ দোযখ থেকে বের করে বেহেশতে পাঠিয়ে দিবেন- এ তথ্যসম্বলিত বর্ণনাসমূহের পর্যালোচনা

এ ধরনের বর্ণনা সহীহ হাদীস হলে সওয়াব-গুনাহ, বেহেশত-দোযখ, ন্যায় কাজে উৎসাহ দেয়া ও অন্যায় কাজ নিরুৎসাহিত করা তথা কুরআন; সুন্নাহ ও বিবেক বলে কোন বিষয়ের অস্তিত্ব থাকে না। তাই এ বর্ণনা কোনমতেই রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হতে পরে না।

পরকালে শাফায়াত পাওয়ার জন্যে সকলকে যা করতে হবে

এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, আমরা কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের আলোকে নিশ্চয়তাসহকারে জানতে পেরেছি-

- ☐ পরকালে শাফায়াতের ব্যবস্থা থাকবে,
- ☐ শাফায়াত সম্পূর্ণভাবে মহান আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন থাকবে,
- ☐ মানুষের মধ্যে রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) ই প্রধান শাফায়াতকারী হবেন,
- ☐ শাফায়াত পাওয়ার জন্যে যোগ্য হতে হবে,
- ☐ প্রায় সব মু'মিনের পরকালে শাফায়াতের প্রয়োজন হবে।

তাই পরকালে শাফায়াত পাওয়ার জন্যে আমাদের যা করতে হবে, তা হচ্ছে–

১. ঈমান ও আমলের মাধ্যমে নিজেকে শাফায়াত পাওয়ার যোগ্য করে গড়তে হবে। অর্থাৎ অন্ততপক্ষে একজন মধ্যম গুনাহগার মু'মিন হিসেবে গণ্য হওয়ার মত আমল থাকতে হবে।

২. শাফায়াত পাওয়ার জন্যে মহান আল্লাহর নিকট নিম্নের যে কোন এক বা একাধিক উপায়ে ঘন ঘন, মনে-প্রাণে দোয়া করতে হবে-

ক. اَللّٰهُمَّ شَفِّعْ لِىْ نَبِيَّكَ

অর্থঃ হে আল্লাহ, আপনার নবীকে আমার জন্যে সুপারিশকারী বানিয়ে দেন।

খ. اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَفَاعَةَ نَبِيِّكَ

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমাকে আপনার নবীর শাফায়াত দান করুন।

শেষ কথা

সুধী পাঠক, আশা করি পুস্তিকার উল্লিখিত তথ্যসমূহ শাফায়াত সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে চালু থাকা কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিরুদ্ধ কথাগুলো উচ্ছেদ করতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। আর এর ফলস্বরূপ যে সকল ঈমানদার ইসলামের কিছু অনুসরণ করছেন আর কিছু অনুসরণ করছেন না এটি ভেবে যে, দোযখে যেতে হলেও কিছুকাল সেখানে থাকার পর চিরকালের জন্যে বেহেশত পাওয়া যাবে, তাদের ভুল ভাঙ্গবে। তাই তারা সকলে ইসলাম পালন করার সময় নেক্‌কার, ছগীরা গুনাহ্‌গার বা মধ্যম গুনাহ্‌গার মু'মিনের স্তরে থাকার চেষ্টা করবে। আর তা হতে পারলে আশা করা যায়, তারা সকলে পরকালে শাফায়াতের মাধ্যমে বা সরাসরিভাবে চিরকালের জন্যে বেহেশত পাওয়ার যোগ্য হবে।

সবার নিকট দোয়া চেয়ে এবং ভুল-ত্রুটি গঠনমূলকভাবে ধরিয়ে দেয়ার অনুরোধ রেখে শেষ করছি। আল্লাহ্‌ হাফিজ!

সমাপ্ত